আ লে য়া

আলেয়া

নিরুপমা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৬২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১১০০ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৩

ছ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

আশ্লেষা

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত বম্পাস টাউনে একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি 'কুটীরে'র ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লান্ত আমরা জন কয়েক মাতুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবে না। আবাস—'ভিলা' বা 'লজ'—তুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে 'কুটীর' নামে অভিহিত। ৺বৈদ্যনাথধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয় কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক একখানি 'কুটীর'ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই 'কুটীরে'র অভ্যাগতবর্গও সুবেশা সঙ্গিনিগণ সমভিব্যাহারে শ্মশানে মশানে বিচরণ করিয়া, কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণাবদ্ধারাও বাঙ্গলা হইতে তুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তা-মাঠে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অন্তঃপুর চারিণী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সে কথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড় দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।) আকাশ

নক্ষত্র-বিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরের জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনারীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফোনের নানারসসমন্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুইদিন হইতে পশ্চিমের দিগড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সে রাত্রে অগ্নি পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্তদত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কি না, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম, এমন সময়ে কার্‌ষ্টেয়ার্স এবং বম্পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাহী সঙ্কীর্ণা শুষ্কশরীরা 'যম্‌না-জোড়' নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল, সেই আলোক বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, 'আলেয়া'—'আলেয়া'। আমরা আগ্রহের সহিত সেই আলোকের নির্ব্বাণ-প্রজ্বলন এবং ইতস্ততঃ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে, যম্‌না-জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল ; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল, বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ 'কান্‌হাইয়া জোড়্' নামে 'যম্‌না-জোড়' অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণা একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যম্‌না-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃতুমন্দ বিস্ময় গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, "ও তো ভুলোর আলো ! ও তো মাঠে মাঠে এমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক'রেই বেড়ায়। 'রাত-বিরাত্' বা রাস্তা-ঘাটে ওদের নাম ক'রলেও বিপদ্ ঘটে ! যেমন অপদেবতার নাম কর্‌লেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠান হন, তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম করলে বা ঐ আলো ধ'রে চল্‌লে, মরণ ত' নিশ্চিত ! তা'ছাড়া আবার ঘরে বসে রাত্রে ওর নাম কর্‌লে, কোন না কোন পথিক, সে রাতে ওর খপ্পরে পড়বেই !"—তাঁহার কথায় তখন আর আমাদের কাণ দিবার অবসর ছিল না। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে ! হাত-পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া, 'থিয়জফিষ্ট্-'বন্ধু' তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের

দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই 'আলেয়া' বলিতে দিবেন না,—এই তাঁহার পণ। বিজ্ঞের তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার রোখ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। বিজ্ঞ বলিতেছেন, "নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! কে বল্‌তে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটা ত খুব বেশী বড় নয়।" তাহার কথা তখন কে শোনে! ঐ আলোকটি যে ভৌতিক, ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এবিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। থিয়জফিষ্ট্‌ তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্‌ ও মহামান্য ওয়ালাস্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদবাবু, মণিলালবাবুর 'অলৌকিক রহস্য' এবং 'ভূতুড়ে কাণ্ডে'র গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের বিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ গল্পগুলো কালকের জন্যে রাখলে হত না?" শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। থিয়জফিষ্ট্‌ নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে 'ব্যূহিত' বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, বিজ্ঞের বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"কিসের ভয়!" তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া, বিজ্ঞ বিনীত ভাবে বলিলেন, "না—ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-বলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে,

তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক্।” তখন এ কথার সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিয়াছিলেন, এমন সময়ে নীচে হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ত্রিকূট দর্শনের সঙ্গী কার্ষ্টেয়ার্স-টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরেরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি-সমাচ্ছন্ন মুখে এ তত্ত্বও প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনিবদের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা করিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন, “রাত্রে ‘ভুলো’র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখ্‌লে ত’? তোমারা মান না কিন্তু আমরা এম্‌নি কত শত প্রত্যক্ষ ফল ফলতে দেখেছি।”

“এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের পৌঁছানো খবর আমাদের দিয়ে যেও।”—*

* তাঁহারা সত্যই সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহুকষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন! কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটিই সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন! তিনিও কোনও কার্য্যানুরোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়াম্‌স্ টাউনে গিয়া হাজির হন! শেষে সেস্থান হইতে গাড়ী করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই ‘প্রহসন ভ্রান্তিকে’ তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।—কিন্তু তাঁহারা কেহই ‘আলেয়া’র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।

তাঁহাদের চাকরদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত 'ভুলোর আলো'র নাম মাহাত্ম্য এইরূপে সত্তপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবি বন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকাডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হ'য়েছে! যদি কেউ এখন সাহস ক'রে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার, তা'হলে দেখতে পাও, যম্‌না-জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধুনী জ্বেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে সেই জ্বলন্ত ধুনীর কাঠটা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

বিস্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! বিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসিটুকুতেই আমরা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলাম! এমন সময় হাসি!—বলিলেন, "তা তো এখন কেউ যেতে পারছি না, অতএব"—

থিয়জফিষ্ট্‌, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন! মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয়

পাইলেই থিয়জফিষ্ট্‌—অভিজ্ঞতা, বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির ক্রোড়-দেশটি সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বলতে চাও, বল!" ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য ঃ

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা বিজ্ঞ বলিলেন, "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধুনীর গল্পই চলুক!"

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সে বহুদিনের কথা! দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘন বৃহৎ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীর বনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানের স্থানের উচ্চতা-রেখা তখন ঐ নন্দন-পাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রুক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাযথ-উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা—বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন 'পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়াম্‌স্‌ টাউনের পত্তন করেন নাই; কার্‌ষ্টেয়ার্স বা বম্পাস টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর-অধিবাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বন মধ্যবাহিনী 'যমুনা-জোড়্' ও 'কানহাইয়া-জোড়'ও তখন এইরূপ বালুকাবিশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহারা 'দিগ্ড়ীয়া' পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি খর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের 'ঢল' নামিয়া নদীতে 'বুহা' আসিত, সেদিন সেই সঙ্কীর্ণা আখ্যাত পার্ব্বতীদ্বয়ের স্রোতোবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্ত হস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেওঘরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় থাকিতেন। তখনও দেওঘরে বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই! যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিল না যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুখে পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দূর-গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে 'দেও' ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচর সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও কেহ জানিত না; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী কিংবা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে ৺বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী ৺বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ

ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্দ্ধস্ফুট শতদল! শ্যামল শালপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি পলাশ, আকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজান্তে উঠিবার সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মাল্য ও প্রসাদ-স্বরূপ 'ত্যাগী বাবা'র হস্তে শিবসাগর-উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকীটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। তখন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহ্বল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শালশাল্মলী পলাশমধূক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি আপ্রান্ত নবপল্লবপুষ্পে ভূষিত; চ্যুতমুকুল, মধূক ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গান যেন বনদেবীরই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জরী-রবে এবং অঞ্চল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের ওষ্ঠস্পর্শী বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বন্য মহিষ, চমরীগাভী, কোথাও বা হরিণদল অদ্য যেন অধিকতর নির্ভয়ে—অধিকতর নির্ব্বিরোধভাবে—যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই

তরুণ যৌবনে পঠিত কুমার-সম্ভবের শ্লোকগুলা সহসা অদ্য তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত-সমাগমকে যেন অদ্য তাঁহার সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

"কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ॥
মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥"

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরে কাব্যের প্রতি এতখানি মোহ আছে? প্রকৃতির এই ঋতুবিপর্য্যয়ে সেই কাব্য-কথাই কেন তাঁহার মনে পড়িতেছে! তাঁহার অন্তর কি এখনও যে কোন ভোগসুখের উপরেই সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হয় নাই! তরুণ যৌবনের সুখলালসার লেশ এখনও কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে! অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই 'অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি'র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—"কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন

বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপল্য সংবরণ কর—নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ!"

সহসা সন্ন্যাসীর গতিরোধ হইল। দক্ষিণের ডালপালাগুলা বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিতদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন! এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব! দুই হস্তে সেই কণ্টকময় ঘনবনের শাখাপ্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্দ্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ-লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহারা সস্পৃহভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত-প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ঈষৎ আর্ত্তভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সে বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মোহ আসিয়াছিল! ভাবিতেছিলেন, "এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই,

নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ —অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অন্তরে কেন জাগিতেছে ? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেবতা তুমি ? হে কিশোর ! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি ! তোমায় কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে হইবে ? কি কথা বলিতে হইবে ?—কোন্ মন্ত্র সে ?"

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি-স্থান-নির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাতপদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষে প্রশ্নভরা চকিত দৃষ্টি ! সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ !—"ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজ কো ডেরা হ্যায় ?"

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্নাসীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন, —"আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমায় কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না !" সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন

সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল! তাহার সেই ঘনকৃষ্ণ বিলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্য্যস্ত কেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়েকটি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির নত করিয়া যুক্তকরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। "ঠাকুরজি! পাঁও লগে! আপ্ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?"—কি সুধাময় স্বর! সন্ন্যাসীর মনে হইতেছিল, কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী বালককে প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কিরূপে জানিল! সেই বা কে? এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল? বালক তাহার চক্ষু দুইটি সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা। তাহারা 'হরদোয়ার (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অদ্য কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন ৺বৈদ্যনাথজীর ধামে

পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু! আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকট অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ!

সন্ন্যাসী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ! ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবাগ্নিও হইতে পারিত?" বালক বলিল,—"তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না, কেন না কয়েকদণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইয়াছে; এক্ষণে দিবা অবসান-প্রায়! লোকালয়-প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন, হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে! ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।" সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা কোথায়?"

বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসঙ্কোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্যে বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায়, সন্ন্যাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি-সংযোগ হইল ; বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল !

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল ; এক্ষণে নিকটে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া ডাকিল, 'পার্বতি ! বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা ! আব্ কুছ্ ডর্ নেহি হ্যায়। ঠাকুরজী সে মুলাকাৎ হুয়া, উন্‌নে আভি তুমকো দেখ্‌নে আতে হেঁ ! তুম্ আচ্ছা হো যাওগে, পুরুষোত্তম কো দর্‌শন করোগে, আব্ কুছ ডর্ নেই, ঠাকুরজী আগিহিন্।"

বালকের অকৃত্রিম সারল্যের এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল, যুক্তহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা ! পার্‌বতী তুমকো বহুৎ ফুকারা। অব্ হামারে আরজ্ ইয়া যোকি হামারা পার্‌বতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও। হামারে লিয়ে মেরা কুছ হর্‌জ নেই।

মেরি জনম্ মোগারৎ হো গিয়া বাবা, লেকীন্ পার্‌বতী কো লিয়ে—”

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—আর বিলম্ব করা উচিত নয়—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়। এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান। বালক ম্লানমুখে তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, “সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।” দীর্ঘোন্নত-দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত-যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজমনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, “এস পার্ব্বতীপ্রসাদ!”—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, “আপনার পদ্ম ফুলটি!” রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, “উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভার পড়িয়া থাকুক!” “না। বৈদ্‌নাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?” সন্ন্যাসী সম্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল, তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ-আঘ্রাণের সঙ্গে ‘আঃ’ শব্দ করিয়া ফুলটি কাণের

উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুঁজিয়া দিল এবং তল্পী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন; কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল পদ্মপুষ্পটি বালকের কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর তিনি হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা একবার দেখিয়া লইয়া, ভারস্কন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

২

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন লছ্‌মীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু-সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। ইহাদিগকে লইয়া সন্ন্যাসীকে অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, রুগ্নের বলকর পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছ্‌মীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্য সংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী কিন্তু অবিরক্ত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদের জন্য এই শ্রম-স্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর

পার্ব্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়; উভয়ে একেবারে কিছুদিনের মত আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সেজন্য সর্ব্বদা আর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া আসার পর লছ্মীপ্রসাদের পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে ফেলিবে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল, মরিতে তো একদিন অবশ্যই হইবে, সে জন্য পুরুষোত্তম-দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কে জানিত যে, তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং ৺বৈদ্যনাথ-দর্শন ঘটিবে। বাবা ৺বৈদ্যনাথ যখন মনুষ্য দেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন; তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম-দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে; ঠাকুরজীর তাহাদের জন্য বহুত তক্‌লিব হইয়াছে। যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদের থাকা উচিত নয়! সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, সম্মুখে ঘোর বর্ষা! যদি তাঁহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাইয়া শরতের প্রারম্ভে যাত্রা করাই উচিত; নহিলে তিনি সে দুরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন! বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্ব্বতেই অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণউদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাঁহার উপর অগাধ নির্ভরতা এবং স্নেহাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সন্ন্যাসীকে যেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল! বালকের পিতা তাঁহার পার্ব্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল—"ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্ব্বতীকে রাখিয়া যাইতে পাইতাম, তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে, তাহার জন্য আর ভাবিতে হইত না। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিবার উপায় নাই। ঠাকুরজী বিরাগী সন্ন্যাসী—তাহাকে লইয়া কি করিবেন!" বৃদ্ধের নিঃশ্বাসটি যেন অন্তঃস্থল হইতেই পড়িল। সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয়-তুল্য কিশোর কুমার! তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ঐ বালকের সাধ্য? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্ব্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন্ প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে

তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তর কাহার কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস-গুহাটি বালক ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃক অধিকৃত; তাই তিনি পর্ব্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাত্রি-যাপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিঃসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সন্ন্যাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহাসম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে—সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদম্য? ভগবান্ শঙ্কর এই মমতাকে এই জন্যই 'পাশ' বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? আর না,—এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।

সেই প্রস্তরখণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকূটের কঠিন নীরস হৃদয়োত্থিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপল-ব্যথিত-গতি নির্ঝরিণী সন্ন্যাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরুঝুরু রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতে-ছিল। সন্ন্যাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন, স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতের অঙ্গে অঙ্গে তাহার ছায়া ফেলিতেছে। আলোকস্নাত লতা-পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ

করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ-গগন ভাসাইয়া বৃষ্টি নামিবে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরের জলে পা ডুবাইয়া পার্ব্বতী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই নির্ঝর-নীর-ধারার ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষেও মেঘের কৃষ্ণছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্ব্বতী একটুখানি হাসিল। সে হাসিতেও পূর্ব্বের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বা কলতান নাই। সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া পড়িয়াছে! পার্ব্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিণের মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীরমন্থর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার এক পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়াছিলে কেন? আমার নিকটে কেন আস নাই!" বালক নতনেত্রে বলিল, "আপনি তো ডাকেন নাই!"

"প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?"

"না, কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল।"

"কেন পার্ব্বতী?"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার নতদৃষ্টি হইয়া বলিল, "আপনি আজ সারাদিনই আমার সঙ্গে কথা কহেন নাই, আর—"

"আর কি পার্ব্বতী ?"

"আর কয়দিন হইতেই আপনি যেন আমার উপর 'গোস্মা' হইয়াছেন, আর কাছে ডাকেন না, ভাল করিয়া কথা"—বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বেদনা পাইলেন,—বালকের নিকট সরিয়া গিয়া, তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না পার্ব্বতী। তোমার উপর তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অন্যমনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।" পার্ব্বতীর অভিমান পড়িল না,—দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল—"কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না—তাহা তো জানেন। তখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না, একা একা বেশ অন্যমনেই তো থাকিতে পারিবেন।" অত্যন্ত বেদনার স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায়, সন্ন্যাসীর মুখ সহসা তেম্‌নি ম্লান হইয়া গেল। বালক ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার কোন্‌ বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে! সন্ন্যাসী মৃদু-স্বরে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ—তাহা জানি পার্ব্বতী!" সন্ন্যাসীর হস্ত ধীরে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অন্যমনে সেই অন্ধকারময় বনের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন-বক্ষে সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণে সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দুষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে

অব্যর্থলক্ষ্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার সে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুরজি! এখান হইতে পুরুষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?"

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"তাহাতো ঠিক বলা যায় না! তবে তোমার পিতার যেরূপ শরীর তাহাতে অন্য যাত্রী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশী সময় লাগিবার সম্ভাবনা।"

"ছয় মাস?—ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে?"

"না, উনি যদি সুস্থ থাকেন—শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পার।"

"ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয়ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহিবেন। এই আগামী শীতের পর বৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী?"

সন্ন্যাসী এইবার একটু ক্ষোভের হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনা-স্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানে না যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অযৌক্তিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাঁহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অবস্থার গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই, এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে চাহিবে? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে, তাহা হইবার নয়! চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া কি হইবে পার্ব্বতী?"

"কেন, আমি আপনার 'চেলা' হইব।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ জীবন। অধ্যয়নাদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরুর হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এ পর্ব্বতবাসে তোমার তো কোন উপকার নাই পার্ব্বতী? এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এ স্থান ভাল লাগিত না। তোমাদের ন্যায় নবউন্মেষিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।" পার্ব্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার গুরু হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।" সন্ন্যাসী হাসিলেন। "হাসিলেন যে! 'চেলা'কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন! আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।"

"তুমি আমার চেলা হইবে পার্ব্বতী?"

"তাহাই ত বলিতেছি।"

"তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ, তাঁহারা মহান্ত বা পরমহংস! আমি নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর 'চেলা' থাকিতে নাই।"

বালক যেন সেকথা কানেই লইল না। বলিল, "বৃষ্টি আসিতেছে, নীচে চলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি এইখানেই

থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে, তুমি এই বেলা শীঘ্র যাও।” তখন হু হু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপদিগকে পর্ব্বতের অঙ্গে আছড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরিণীর জলকে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্ব্বোন্নত শিখরে যেন লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “মনে করিবেন না যে, বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব। আমি ইহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।” সেই বৃষ্টিধারা-প্লাবিত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পাদপ ও লতার শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্ব্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন “পার্ব্বতি! —পার্ব্বতি! ফিরিয়া এসো।” বালক ফিরিল না, কিংবা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কর্ণেই প্রবেশ করিল না! সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন—“অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?” প্রকৃতির সেই তুমুল বিপ্লবের মধ্যে তড়িৎ-প্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল—“আমরা যে আর বেশীদিন এখানে থাকিব না, তাহা কেন আপনার মনে থাকে না?”—বালক ফিরিল না, পর্ব্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল; অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গেই চলিলেন। মুহুর্মুহুঃ তিনি তাহার পতন-শঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সে গর্ব্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে গুহার নিকটে পৌঁছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট

হইলে সন্ন্যাসী একটা শিলার নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিণীর আকারে মেঘ-গলিত জলস্রোত কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষ লতা সব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধূমের আকারে নামিয়া তাহার শিখরদেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত গুহা-দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন—বালক বোধ হয়, তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া, সেইখানে বসিয়া সিক্ত কেশগুলা লইয়া অঙ্গুলীতে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অভিমানভরা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছে! অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলীপ্রভা এবং সেই দৃষ্টি, অন্ধকার গুহার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে; দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভিমানও যেন সেই বৃষ্টি-ধারার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল। হাসিমুখে তখন সে গুহার ভিতরে পিতার নিকটে সরিয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসীও আবার নিজ নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রারম্ভেই লছ্মীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইলেন; কিন্তু পার্ব্বতীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উত্তেজনার কয়েকটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখে চোখে যেন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। যাত্রার

জন্য সে পিতাকে পুনঃ পুনঃ সত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতাসূচক অভিভাষণের বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এজন্য একটু বিষণ্ণ ভাব কিংবা এককোঁটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সন্ন্যাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী যে বালককে অনেকখানিই ভালবাসিয়াছেন তাহা বৃদ্ধ বেশ জানিত: এক্ষণে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সহসা কি যেন বলি-বলি করিয়া বলিল—"উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল; স্নেহের প্রকৃত সম্মান জানে না।"—সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন প্রভেদ নাই: উভয়কেই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। উভয়েই স্নেহের পাত্র; কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না, সেজন্য দুঃখের কোন কারণ নাই, উহাই উহাদের প্রকৃতি।" বালক এইবারে পিতাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্নাসীর সঙ্গে সঙ্গে বহুবার নিম্নে গমনাগমন করিয়া পার্ব্বতী বনপথ বেশ ভালরূপেই চিনিত। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল গতিতে পার্ব্বতী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পোঁটলা স্কন্ধে ছুটিয়া চলিল। তাহার চঞ্চল কেশগুচ্ছযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ 'মুরাঠা'-বাঁধা বৃদ্ধের শির শীঘ্রই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। বৃদ্ধ পুনঃপুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া শিলাখণ্ডে 'হোঁচট' খাইয়াছিলেন; কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার নবনির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। সে পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সন্ন্যাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতালেই সেই পদশব্দের তাল ও লয় হইতেছে। উর্দ্ধগতি হরিণীর মত সে-ই ছুটিয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসী চেষ্টার সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিলে যে?" "একটি জিনিষ ভুলিয়া ছিলাম।" পার্ব্বতী তেমনি দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুষ্কপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠায় বাঁধা! সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি জিনিষ?" সে কথার উত্তর না দিয়া পার্ব্বতী গুহার সম্মুখে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল! একপার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ ধীরে ধীরে ধূমাইতেছিল, পার্ব্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসিমুখে বলিল, "এই ধূম লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার এই ধুনীতে তো সর্ব্বদাই আগুন থাকে, দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিবে! এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন 'ডেরা' খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব। কেমন? একথাটি মনে রাখিবেন ত?"—ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সন্ন্যাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন। পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না

করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য করিবার যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্ত্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতেছিলেন, তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্ব্বে এই পর্ব্বত্যভূমি যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই! আজ তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কাহার কলহাস্য বাজিতেছে, নির্ঝরিণীর কলস্বরে কাহার অবাধ-প্রবাহিত কলকণ্ঠধ্বনি! বনের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ঐ যেন কাহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, শুভ্রস্নকুমার করলতা চকিতে খেলিয়া আবার তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্ব্বত অঙ্গেই সে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্ব্বত বক্ষে তাহার আবাসস্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধা ঐ যে নির্ঝরিণী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, গুহাদ্বারের ঐ যে সোপান সমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বালঅশ্বত্থটি যাহার অঙ্গে তাহার হস্তের শতচিহ্ন রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হরিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য—সব শূন্য। নাই—সেখানে সে নাই,

তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষস্পন্দনের সমতালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে। একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন। বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবার উপায় নাই, তথাপি বহুদিনের গতায়াতের অনুভবে সন্ন্যাসী বনতল দিয়া সেই পথ যেখানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহই নাই, কিছুই নাই,—প্রান্তর মনুষ্য-চিহ্ন-বর্জ্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে, এখন প্রদোষ! যাত্রার প্রথম উত্তেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আরক্তিম বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা!

তারাচন্দ্রসজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, আবার প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোক-ধারা মাখাইয়া উদিত হইলেন। নির্ঝর-স্নাত সন্ন্যাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন; মনে হইল, বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গাহিতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া 'এহি সূর্য্য' বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে! সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই

করসংযুক্ত বহ্নির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সন্ন্যাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূম-রেখা নাই! সন্ন্যাসীর অন্তরটি সহসা ধক্ করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল!—তবে কি অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে? সে যে বলিয়া গিয়াছে—সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না; কিন্তু অন্যমনে সন্ন্যাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠখণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। অন্যমনেই সন্ন্যাসী আর একখানা শুষ্ক গুঁড়ি-কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া, সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ—হেমন্ত—শীত অতীত হইয়া আবার সেই বসন্তের পার্ব্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল; কিন্তু কোথায় এবার তাহার সেই রূপ! তাহার পত্রপুষ্পে কোথায় সে রাগ! কোথায় সে সুগন্ধ!

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সেই সদ্য-প্রজ্জ্বলিত ধুনীটি গুহার ঈষৎ অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন, জলধারায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ—হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনার চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসী ক্রমেই যেন শীর্ণ হইতেছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহরে প্রায় সর্ব্বক্ষণই

তিনি নিজ-গুহা-সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন ; আর নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্ব্বাণঅগ্নি ধূমরাশি দ্বিগুণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, এ কি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সন্ন্যাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জোর করিয়া নিত্য তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণবস্তু যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে! সে আসিবে মনে করিতেও সন্ন্যাসী অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন; কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কিংবা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকের এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে, আজ কালই সে আসিবে, ততই তাঁহার মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কিংবা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহার পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিঃশ্বাস। উত্তেজনার অশান্তিতে সন্ন্যাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটি শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন—আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই

অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে—সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধুনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল, সে আসিল না। বুঝি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে আর একটু বড়ও হইয়াছে, বুঝিয়াছে যে, সে সঙ্কল্পটা নিতান্তই বালকোচিত! তাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না! সন্ন্যাসী স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকে আটকাইয়া রহিল,—নাসাপথে অগ্রসর হইল না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিল! সন্ন্যাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজকে শুষ্ক, দগ্ধ এবং ভস্মসাৎ করিয়া নিদাঘ রুদ্রপ্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষাণহৃদয়োত্থিত স্নেহধারা শুষ্ক, বিশীর্ণ, লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দগ্ধ দেহের কালিমা ও ভস্ম, নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গেল,—গিরিনির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দগ্ধ তাম্রবর্ণ দিগন্তের ঘন মেঘ তাহার স্নেহধারা-সঞ্চিত স্নিগ্ধ শ্যাম সজল আভায় নিখিলের তপ্ত রুক্ষ হৃদয়-নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার করুণা-ধারার মত ধারায় ধারায় আশীর্ব্বাদ-বারি জগতের মস্তক

ও বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী সংশয়াপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব! এই যেন সে অনুতাপে ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দগ্ধভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল—আবার তাহার এ কি রূপান্তর! যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকেই আবার বাঁচাইতে এ কি অজস্র স্নেহাশ্রুনিষেক! কই—এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষে উপ্ত সেই মায়ার বীজকে সে তো ধ্বংস করিতে পারে নাই! সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমনি ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে,—উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র! হায় প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে তাহা যে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অন্তরের ফলফুল, স্নেহ, আশা—সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়—অমনি করিয়া পোড়ে—কিন্তু কই, তোমার মত তো আর তাহারা বাঁচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বহুদিনের নির্মেঘ আকাশে সহসা সেদিন প্রবল মেঘ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুষ্ক চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি সবল হইতে লাগিলেন।

৩

কাল রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী নিজ গুহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার বোধ হইল, রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্ব্বদিন দগ্ধ

কাষ্ঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ ভস্মরাশি ধুইয়া বহিয়া গিয়াছে। ধুনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নির্ব্বাপিত!

নিবিয়াছে?—অদ্য দুই বৎসর যাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সন্ন্যাসী নিজের অনিচ্ছায়ও সাগ্নিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তাহার সমিধ যোগাইয়া আসিয়াছেন, অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সন্ধুক্ষিত অগ্নিহোত্র আজ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দিয়াছে। কেহ জোর করিয়া নিবায় নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাঁহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তির গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া গুহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল, পর্ব্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগস্নেহান্ধতার ফলভোগস্বরূপ কালব্যাপী জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাঁহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে; ঐ ধুনীর আপনা হইতে নির্ব্বাণই তাহার প্রমাণ! সন্ন্যাসী আজ বহু দিন পরে পূর্ব্বের মত নিজের আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতি-চিন্তালীন, মায়াবন্ধহীন, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিত্বকেও যেন অনুভব করিলেন!—এতদিন ভয়ে তিনি সে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।—মনে হইত, এখনি সে কোন্ নিভৃত স্থান হইতে 'ঠাকুরজী' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সন্ন্যাসী নিজের

আসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সেই গুহায় বহিয়া আনিয়া পূর্ব্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি-অন্তরালে অস্তমিত। গুহামধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বহুদিন তিনি এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতৃপ্ত অন্তরে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপট্টে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ও কে! রুক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহ্নে আকাশতলে মেঘাসনে যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাবৃট্-সন্ধ্যা। সন্ন্যাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সন্ন্যাসীর বোধ হইল, সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল, বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি-প্রভায় তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে, একটা অজানিত পুলকে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি এ! কে এ! সান্ধ্য-রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত সুবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরোষ্ঠ হইতে একটা 'প্রভা-তরল জ্যোতিঃর' ছটা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন, "কে এ! কার এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?"

"ঠাকুরজী!"

"কে তুমি? কে? তুমি কে?"

উত্তর না দিয়া সে সন্ন্যাসীর চরণতলে নত হইল, তাহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী চিনিলেন, হ্যাঁ— সেই মুখই বটে! কিন্তু তবু এতো সে নয়! এই দুই বৎসরে তাহার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পার্ব্বতী?—না, তবে কে তুমি? পার্ব্বতীরই মত, অথচ সে নও।—কে তুমি—তবে?" সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া—সেই গৈরিক-বসনা সন্ন্যাসীর পানে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল—"কই আপনি ত ধুনী জ্বালিয়ে রাখেন নাই? আজ সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।"

হ্যাঁ, সেইই বটে! ঐ যে পর্ব্বত অঙ্গে তাহার আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি, স্থিরভাবে অদ্য দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান করিতেছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর স্নিগ্ধভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসম্বলিত বনের ব্যগ্র বাহু তাহার হারান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবার জন্যই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম-স্নিগ্ধ স্নেহ-বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তাহার প্রাপ্ত-নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া লইতে চাহিল। হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ-ব্যগ্র বাহু-প্রসারণ, এই বক্ষ-বিস্তার!—"আসিয়াছে, সে আসিয়াছে!" কাহার আগমনে নির্ঝরিণীর এই আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি! যাহার আগমন-প্রত্যাশায় তাহারা অদ্য দুই বৎসর অন্তরে বাহিরে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু

এ বুঝি সে নয়! সে যে বুকে ধরিবার বস্তু—স্পর্শক্ষম রত্ন, আর এ কি? এ যে প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখা! তাহার স্বর, তাহার মুখ, তাহার হাসি, তাহার নাম লইয়া আজ এ কে আসিল? কেন আসিল? এই ব্যগ্রবুকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোঘ্রাণ লইবারও যে উপায় নাই; এ যে স্পর্শেরও অতীত! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাপট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্ব্বতীর অতীত-দৃষ্ট বালক-মূর্ত্তির স্মৃতি এখনকার এই তরুণীর সঙ্গে মিলিয়া সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য বোধের একটা আলোক জ্বালিয়া দিল।

পার্ব্বতী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনা হইতেই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী সহসা সচকিত হইয়া সরিয়া বসিলেন, মৃত্থ স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার পিতা?"—পার্ব্বতী নতমুখে উত্তর দিল, "আজ ছয় মাস হইল, পুরীসমুদ্রের স্বর্গদ্বার-সৈকতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" সন্ন্যাসী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"পার্ব্বতী?—তাহার কি হইল?" তরুণী আবার তাঁহার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, ঠাকুরজী!"

"না, কারণ, তুমি ত সে পার্ব্বতী নও। তুমি ধুনী জ্বালিয়া না রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,—তুই বৎসরের দিবারাত্রি-প্রজ্জ্বলিত ধুনী এই পর্ব্বত আজই নিবাইয়া দিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তখন এই বনতলেই ঘুরিতেছিল। সেই পার্ব্বতীর দেহ লইয়া অন্য একজন তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়াই সে এ অগ্নিহোত্র নিবাইয়াছে। এ পার্ব্বতীকে তাহারা কেহই

চিনে না।” সন্ন্যাসীর এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে পার্ব্বতী মস্তক নত করিল, কিন্তু উত্তর দিতে বিরত হইল না। “আমি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছি দেখিয়াও ত সে অনাবশ্যক অগ্নিটা নিবাইয়া দিতে পারে!” পার্ব্বতীর এ উত্তরে সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া উঠিলেন। “তাই কি? তাই কি তাঁহার অন্তরও আজ এত শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? আকর্ষণকারী অথবা আকৃষ্ট বস্তু নিকটে আসিয়াছে বলিয়াই কি এই নিশ্চিন্তভাব?”

পার্ব্বতী বলিয়া যাইতেছিল,—“পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমায় বালক সাজাইয়া রাখিতেন, আমিও চিরদিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া, পরে পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই আশঙ্কায় আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালক-বেশে রাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি এমন অন্যায় হইয়াছে? আমি তখনও পার্ব্বতী ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। কেবল পিতা শেষে এ জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। আপনি ছদ্মবেশ মনে করিতেছেন বলিয়াই একথা বলিতেছি, নইলে আমি জানি, সেই-ই আমার চিরদিনের বেশ। সারাপথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি। পিতা পুরুষোত্তমের পথে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। সেখানে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় এক বৎসর লাগে। ছয়মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।”

"তাহার পরে ?"

"তাহার পরে আর কি ? শ্রাদ্ধ সারিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়ি।"

"কেন বাহির হইলে ?"

"কেন বাহির হইলাম ?" বিকশিত পদ্ম নেত্রে যেন ব্যথার তড়িৎ স্পর্শ করিল।—"কেন ? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব ?"

সন্ন্যাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার পিতা কি তোমার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই ? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয়মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই ? কাহারও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই ?"

"রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

"তবে ? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই ?"

"কেন করিবে না ? আমি সেখানে থাকিব কেন ? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে ?

"কেন এমন কাজ করিলে ?"

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, "বেশ করিয়াছি।" তাহার ব্যথিত ক্রোধপূর্ণ স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর পানে চাহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার বৃক্ষতলে ঘনতর হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিতে

লাগিলেন, "তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নাই, তাহা ত তোমার পিতার মুখেই শুনিয়াছ।"

"আমি সেকথা মানি না। আমি আপনার 'চেলা' হইব, তাহা তো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তুমি স্ত্রীলোক!"

"হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা থাকে।

"কাজ বড়ই অন্যায় করিয়াছ! তোমাকে আবার হয় পুরুষোত্তমে, নয় পূর্ব্ব-বাসস্থান হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"এই সুদীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি ততদূর ফিরিয়া যাইব!"

"হাঁ!"

"যাইতে পারিব কেন?"

"তা তুমি পারিবে।"

"যদি না যাই?—তাড়াইয়া দিবেন,—কেমন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ।"

"আজই? এখন কি? দেন তবে—"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসীর বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পর্ব্বতপৃষ্ঠগুলি দ্বিগুণ কঠিন ও স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি একেবারে নিঃশব্দ—বায়ুস্পন্দহীন।—পূর্ব্ব-আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে যেন এই ব্যাপারের শেষ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা

কহিলেন, যেন বহুদূর হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসার মত সে শব্দ,—"তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই?"

"তাহাতে কি! আমার এমন কতদিন যায়।"

"আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি! পার্ব্বতী! তোমার ঝরণার জলে স্নান করিয়া এস।"

"আপনি ব্যস্ত হইবেন না! আমার তেমন ক্ষুধা-বোধ হয় নাই।"

"আমার কিন্তু হইয়াছে, পার্ব্বতী! আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি, তুমি স্নান সারিয়া লও!"

সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে গিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বহু চেষ্টায় অগ্নি জ্বালিলেন! এ দুই বৎসর আর এ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসর যাহার হস্ত-প্রজ্বলিত-অগ্নি এই গুহার বুকে, তাহার স্মৃতির সঙ্গে দিবারাত্র ধূমাইয়াছে, আজ তাহারই এখানে স্থান নাই, বুঝি তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিলেও প্রত্যবায় আছে। হায় প্রভু শঙ্করাচার্য্য! যে নারীজাতির দোষের কথা বলিতে তুমি 'অচতুর্বদনো ব্রহ্মা' হইয়াছ, পার্ব্বতী সেই জাতি! প্রাণিগণের শৃঙ্খলস্বরূপা, নরকের দ্বারকথিতা হেয় নারী সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝি দয়ারও অযোগ্যা সে!

সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে নাই—সরে নাই! বুঝিলেন

বালিকার পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে? তাহার এই দারুণ অধ্যবসায় ও পথকষ্টের প্রথম সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিরিবার কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছে। এ কার্য্যটি তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযোগী হইলেও যে মহান্ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বহুদিন স্নেহযত্ন দেখাইয়াছিলেন, সেই মানব-ধর্ম্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্ব্বতী এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন! হায় কেন তাহা হইল না? কেন তাঁহার সেই সুখস্পর্শ কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিল? যাক্ সে খেদ, সে স্নেহবন্ধনও যে এইরূপে কাটিয়া গেল, সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এ ত সেই পার্ব্বতী, যাহার জন্য আজ দুই বৎসর—না, তাহাকে নিকটে রাখা হইবে না, তবে মিষ্ট কথায় অন্ততঃ আগামী কল্য ইহা বুঝাইয়া দিলেও চলিত! আজ তাহার দুরন্ত পথশ্রমোপনোদনের জন্য আতিথ্য-স্বীকার করাই —সস্নেহ—ব্যবহার প্রদর্শনই—কর্ত্তব্য ছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “পার্ব্বতি! স্নানে যাও।”—পার্ব্বতী নড়িল না—উত্তর দিল না! তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর-মাখা কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, “পার্ব্বতিয়া! কথা শুনিবে না?”

মুহূর্ত্তে পতনশীলা পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্ব্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্রহস্তে সন্ন্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল, "বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিবেন? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। যাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনার কিছুই খাইব না। দেখিব আপনি কিরূপে অতিথি সৎকার করেন! বলুন, শীঘ্র বলুন!" —হস্ত-মুক্ত করিয়া লইয়া সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্যে ও কার্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন, "এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার করিবে না?"

"না।"

"আচ্ছা, তাহাই হউক! তুমি এই পর্ব্বতেই থাক।"

আবার মুখের হাস্য-বিজলী খেলাইয়া পার্ব্বতী ঝরণার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল;—স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল —সন্ন্যাসী তখনও একভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি আপনার অতিথি সৎকার? সরুন, আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।" সন্ন্যাসী ত্রস্তে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহাস্থ আলোকও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া সন্ন্যাসী

গুহা মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্ব্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।" পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, "সারাদিন পথ-হাঁটার পর এরকম পরিশ্রম কি আমার প্রায় প্রত্যহই করিতে হইত না! এখন আহারে বস্থন; সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়ে ত ফলজল ছিল!—" সে কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্‌বতিয়া! আমায় বাকি আতিথ্যটুকুও অন্ততঃ করিতে দাও;—তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।" পার্ব্বতী এবার তুই বৎসর পূর্ব্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, "আপনার অতিথি-সৎকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রকমের হইয়াছে, এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এতো আমার গুহায় আমার গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটিতে তো আমার গৃহস্থালীই ছিল!"

"না, আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপনা প্রকাশ করিতেছে, তুই বৎসর পূর্ব্বের পার্ব্বতী এতখানি জানিত না! কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বালক পার্ব্বতীই আছ বটে কিন্তু কার্য্যতঃ"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী থামিলেন। পার্ব্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সেই নারীত্বের নবীন আভামণ্ডিত মুখের উপরে গুহার দীপ্ত আলোক পড়িয়া যে অপূর্ব্বশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া

গেলেন। বুঝিলেন এই নারী যেখানে চরণপাত করিবে, সেইখানেই গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে! হায় রমা! নিজ শ্রী-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পার্ব্বতী বলিল, —"কই বসুন!" "তুমি?"—আবার সেইরূপ সলজ্জ সহাস্যে মুখ নত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"এর পরে।" সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে দেবতাকে আহার্য নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস-চক্ষে তখন বাল্য-যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই গৃহে স্বজনসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীর প্রীতি! তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্ত্তব্য ও স্নেহ সেবায় পূর্ণ কল্যাণ-হস্তঘেরা গৃহস্থালী! বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ, গৃহবাসে অনিচ্ছা, দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই 'গৃহ' অদ্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল!—

পার্ব্বতী গুহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল,—নিজ মনে বলিল, "আপনার আসন-কমণ্ডলু আবার এই গুহাতেই আনিয়াছেন, দেখিতেছি! উপরের গুহায় লইয়া যান—নহিলে আমি কোথায় থাকিব?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর

দিলেন না। আহারান্তে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষশাখার ব্যবচ্ছেদ-পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব্ব মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "তবে আমি এই গুহার মধ্যেই থাকি? আপনি উপরের গুহায় যান।"

"যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই।"—"ভয়?"—অবজ্ঞার হাসির সহিত মস্তক নাড়িয়া পার্ব্বতী গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের কথা বলাই নির্বুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে, সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! এই অসামান্যা নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বিংশবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এই ষোড়শবর্ষে কি এতখানি শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্য্যাগ্নিতেজ-মধ্যস্থা শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে? সেই ছদ্মবেশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ-উদ্ভূত অদ্ভুত স্নেহের তিনি প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার এই দুর্দ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু

বালিকার কি গতি হইবে ? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত সুখাশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে ! চিন্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না ! গুহামধ্য হইতে সেই পদশব্দ ! তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী বাহিরে আসিল। "গুহার মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে।"—বলিয়া পার্ব্বতী সেই গুহাদ্বারে শুইয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশরাশি শৈবালের মত চারিদিক আঁধার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতি ! তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই ?"

পার্ব্বতী একটু নড়িয়া চড়িয়া চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল, "আঃ, আপনি এখনো তাহাই ভাবিতেছেন ?—করিয়াছিলেন।"

"কাহার সহিত।"

"যাহাকে আমার ভার দিয়াছিলেন, তাহার সহিত।"

"তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া সে হয়ত তোমায় কত খুঁজিতেছে !" "তাহাতে আমার কি !" পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইল, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে ! সেই অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হয়ত জগতের কত প্রার্থী হৃদয়ের অমূল্য-রত্ন। সন্ন্যাসীর নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল ! আপনার সেই প্রথম যৌবনে পঠদ্দশায় সদা জাগ্রত কামনার স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহার বর্ণনায় কবি তাঁহার সমস্ত

কল্পনাভাণ্ডার উজাড় করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, কবিকল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী, অদ্য যেন এই প্রস্তর-বক্ষে অনাদরে অপমানে লুণ্ঠিতা হইতেছে।

ঘুমের ঘোরে পার্ব্বতী আবার পাশ ফিরিল, চুলগুলি মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধের অতি আদরের—গর্ব্বের সেই ভ্রমরনিন্দিত কেশগুলি অযত্নে এখন জটা বাঁধিয়া গিয়াছে।—সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে, একটু গুছাইয়া রাখিতে মন যেন বিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়!

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন!—বালিকার ভাগ্যে যাহা হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে! 'জিতং জগৎ কেন?—মনোহি যেন'! এ জগৎময়ী 'শূর' তাঁহাকে হইতেই হইবে।

৪

পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহনান্তে বর্ষা-বারিপূর্ণা খরস্রোতা 'যম্‌না-জোড়'কে একটা কাষ্ঠের ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিম বনভূমে পৌঁছিলেন, এবং নিঃশ্বাস-ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ত্রিকূটের তিনটি চূড়ামাত্র জাগিয়া আছে, বাকি সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্তদর্শন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এবং নদীস্রোতের দুরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড

মিলিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এবং বনের ব্যবচ্ছেদপথে নদীতীর ও ত্রিকূটশিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিন কতক ঐ স্থনেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া বনের ফল ও নদীর জল পানান্তে নিরাপদে রাত্রিযাপনের জন্য শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

রাত্রি আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি এই আলোকচ্ছটা দেখিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই!—কিন্তু এই কি তাঁহার মনোজয়? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ত্রিকূট-শিখর কয়টি দেখিবার বাসনা ত কই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সে কি দুরন্ত অনির্ব্বাণ ধুনীই জ্বালিয়া দিয়াছে!

হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বসিয়া রহিলেন! প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক পত্র-কম্পনে "ঐ সে আসিতেছে" ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না। সন্ন্যাসীর ভয় একটু কমিল! এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আন্দাজ না করিতেও পারে! সন্ন্যাসী এইরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন দেখিয়া অভিমানিনী সে—ত্রিকূট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিজদেশ অভিমুখে চলিয়া যাইতেও পারে! কিন্তু তাহা যদি সে না যায়? তাহার দুরন্ত পণ ও দুর্দ্দম প্রকৃতিবশে যদি সে ঐ পর্ব্বতেই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে?

ত্রিকূট-শিখরের দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সন্ন্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগড়ীয়া পাহাড়ের উপর যেন একদল কৃষ্ণহস্তী যূথবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বপ্রক্রীড়ায় পর্ব্বতের শ্যামঅঙ্গ মুহুর্মুহুঃ উদ্ভাসিত। ক্রমে সেই গগন-হস্তিদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইয়া ত্রিকূট, দিগড়ীয়া প্রভৃতি পর্ব্বতগুলির মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন একখানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধরিল। তাহাদের গভীর বৃংহিতের সঙ্গে 'হু হু' 'বোঁ বোঁ' রবে যোগ দিয়া শিলাকোটর-মধ্যগত সন্ন্যাসীর কর্ণে যেন একটা ঘোর উন্মত্ত হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ত্রিকূট পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহার কি ভয় হইতেছে! কিসের ভয়!—এই ত একটা বস্ত্রখণ্ডের নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন! মেঘের এই অপরূপ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটু সুখের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের মন্দ্রে বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া বলিতেছিল, "ভয় নাই, আমি নিকটেই রহিয়াছি!" কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল। যেন মনে হইতেছিল নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে, তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু ব্যর্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না! বিরাট্ সমারোহে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুর্মুহুঃ শব্দময় করিয়া তড়িন্ময় ধারা বর্ষণে

বনভূমিকে শোণিতরক্ত গৈরিকবারিতে প্লাবিত করিয়া তুলিল! ভূমির সেই শোণিতময় স্রোত, উচ্চভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকল্লোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া নিম্ন-'খাদে' পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ উপচাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগিল। জল—জল—জল! আকাশ হইতে ধারার পর ধারা অশ্রান্ত ভাবে নামিয়া, ধরণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শুধু অনিবার জলস্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা পড়িতেছে মাত্র। জলস্থলশূন্য—সর্ব্বত্র সমান অন্ধকার, কেবল এক একবার বিদ্যুৎ-বিকাশ ও মেঘের স্বননে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ, নদী শোণিতজলপূর্ণা, বৈতরণী ক্ষিপ্রবেগশালিনী! সন্ন্যাসী শিলাকোটরসঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকার পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল। চকিতে তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে! ভ্রম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন—এবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সে-ই নিশ্চয়। এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সন্ন্যাসী সভয়ে ত্রস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিভাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, এ ভয় তাঁহার

নিরর্থক। সম্মুখে এই তরণীহীনা ক্ষুরধারা নদী—কাহার সাধ্য এ সময়ে ইহার জল স্পর্শ করে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুরন্ত নদীই তাঁহার অসিহস্তা প্রহরিণী।

নদীর অপরতীরে সহসা ও কি শব্দ! হাঁ সেই ত'! তাহারই এ কণ্ঠস্বর! এত সেইই—উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতেছে! ভাষা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুনঃপুনঃ সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনে হইল, সে যেন বলিতেছে "আলোক জ্বাল, ওগো, জ্বাল আলোক আবার! কেন নিবাইলে? কোথায় কোন্ দিকে তুমি—আমায় আর একবার বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল!"

আবার বিদ্যুৎ-বিকাশ! ঐ ত' নদীতীরে সেই-ই দাঁড়াইয়া! আবার সেই আর্ত্তকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই 'আলোক' শব্দটি ব্যতীত অন্য ভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সন্ন্যাসীর মনে হইল, যেন সে চীৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে:

"আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি ঐখানেই আছ! আবার যদি পালাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—"

সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি-রহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বুজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্ব্বাগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ উদ্রিক্ত করিয়া মাথা

নাড়িতেছিল,—"না—আলো জ্বালা হইবে না। জয়ী হইতেই হইবে।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, "এখনও তোমার জয়ী হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনাযুক্ত স্নেহপ্রেমের প্রতিঘাতস্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উত্তেজক খেয়ালে নানাশাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোঁকের বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসপন্থা লইয়াছিলে —ইহাতে সেই মহাসন্ন্যাসী মহাযোগীও প্রতারিত হন নাই। তিনি তোমার হৃদয় বুঝিয়াই সেই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই লোকতুর্লভ নির্ম্মাল্যটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভোগ নহিলে তোমার তুর্ব্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল সঞ্চিত হইবে না। যাহা দিলাম, মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার অত্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে স্নেহ-প্রেম-ভোগে তৃপ্ত করিয়া লও! দম্ভ ত্যাগ কর, দম্ভ লইয়া আমার নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশির না হইলে আমার নিকটে আসিবার উপায় নাই।"

দর্পোন্নত মস্তক, তাঁহার সে করুণা মস্তক পাতিয়া লয় নাই; বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্জ্জিত হইয়াও পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন, সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই; এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে। ঐ যে জলস্থল, বন-পর্ব্বত একযোগে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"অনল জ্বাল, তোমায়

এ আগুনে পুড়িতেই হইবে।” তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, “আলোক জ্বালিলে না ?—পলাইতেছ ? কোথায় পলাইবে ?—আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।”

বিমূঢ়ের ন্যায় সন্ন্যাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না! সহসা একটা অন্যপ্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—যেন জলের প্রবল আস্ফালন-শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে—এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল ?—সন্ন্যাসীর হস্ত এবারে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চীৎকার—“এখনো একবার আলোক দেখাইয়া বুঝিতে দাও, কোন্ খানে তুমি আছ,—জ্বাল একবার আলোক।” বনতল সমস্বরে চীৎকার করিল “আলোক, আলোক, আলোক!”

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গর্জ্জন! জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোল-শব্দ ? পর্ব্বত হইতে ‘বুহা’ নামিয়া, ‘যম্‌না-জোড়’-বক্ষে ‘বানের’ ন্যায় প্রমত্ত স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠহস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী-বুহা-জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ঘোর রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে! সেই কাষ্ঠদণ্ডস্থ আলোক-রেখা সম্পাতে সেই ফুটন্ত রক্তধারার মত জল যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে! কে কোথায়! কে আলোক দেখিবে ? কে

আলোক চাহিতেছিল,—কোথায় সে? সন্ন্যাসী আলোক-দণ্ড হস্তে সেই রক্ত-স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই ত উত্তাল নদী-তরঙ্গ! এইত তাহার অনুস্তরণীয় বেগ। ইহার মধ্যেও আলোক হস্তে তোমায় খুঁজিতেছি, এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই! যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া লইতে দাও, খুঁজিয়া পাইতে দাও! কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির প্রজ্বলিত অনির্ব্বাণ আলোকের সম্মুখে একদিন আবার তোমায় পড়িতেই হইবে! এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে!

হুহু ধূধূ! লুপ্ত জল-ধারা, শুষ্ক নদীবক্ষ অফুরন্ত বালুকার রাশি শুষ্ক রুক্ষ ভূমির প্রকটপঞ্জরাস্থি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল স্রোত মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে ত্রিকূট ও পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝখানের অবাধ আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে! জ্বলিতেছে। সেই শুষ্ক নদীতীরেও সেই অনির্ব্বাণ ধুনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—"কোথায়, ওগো কোথায় তুমি!"

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেই-খানেই বসিয়া রহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে!"

অপমান না অভিমান ?

পাঠশালার ছুটীর পর কয়েকটি বালক এমনি একান্ত মনঃ-সংযোগের সহিত পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া 'গ্রামভারি' চালে গল্প করিতে করিতে গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছিল যে তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে দর্শকের মনে কোন সংশয়ই জন্মিতে পারে না। তাহাদের কুঞ্চিত ভ্রূ, কুটিলদৃষ্টি, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত এবং সাবধানতাসূচক কথাবার্ত্তায় তাহারা যে কোন একটা বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বরেও এমন একটা রুদ্ধ কোপ এবং উদ্বিগ্নতার আভাস প্রকাশ পাইতেছিল যে বোধ হয় বিলাতে পার্লামেণ্ট অধিবেশনে William IV-এর দত্ত Charter of Rights চার্টার অফ্ রাইটস্ হইতে বঞ্চিত হইয়াও সে সভার সদস্যবর্গ ইহাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইতে পারিতেন না। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রামখানির এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্ক, পিট্, ক্রমোয়েল্, (গ্রাম্য) হ্যামডেন্ গ্রাম্যপথে একটা বিষম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে তাহাদের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

ভোলা বলিল—"না,—আর চুপ করে থাকা উচিত নয়! এই বেলা এর একটা প্রতিকার না করলে ক্রমে আমাদের আর কেউ গ্রাহ্য করবে না। এখনি আমাদের দলের প্রায় অর্দ্ধেক

ছেলে ওর দলে গিয়ে মিশেছে। আমাদের দলে আর ক'টা ছেলে আছে? নীলেই সকলের ইষ্টিগুরু হ'য়ে উঠেছে!"

মধু বলিল—"শালা যে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে! পড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই 'ক' বলতে 'ঠ' বেরোয় মুখ দিয়ে, ভোমা গোয়ালা, ব্যাটা ষাট্ বছরেও নাবালক, তিনি হ'লেন পাঠশালার সর্দ্দার প'ড়ো। সকলের উপর হুকুম চালাচ্ছেন, শাসন করছেন, বাহবা দিচ্ছেন, পণ্ডিতটা পর্য্যন্ত ওর তরফে; নীলে যাকে মন্দ বলবে সে-ই মন্দ, যাকে ভাল বলবে সে-ই ভাল। ব্যাটা কি পণ্ডিতটাকেও ওর গোয়ালের গরুর দুধ খাইয়ে যাদু বানিয়েছে?"

বিচক্ষণ রতন বলিল—"আরে দূর! ওটা ত 'মায়ে খেদানো বাপেমারা' ছেলে, ওর আবার গরু, না তার দুধ। নরেন জমিদারের ছেলে, তারই বাবার পাঠশালা। নীলে সেই নরেনের প্রাণের ইয়ার, কাজেই পণ্ডিতটা 'ভয়ে ভক্তিতেই' ওকে 'নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ' করে।"—নবাগত হরি প্রশ্ন করিল—"ওটা নরেনের সঙ্গে জুটল কি করে?"

"আরে সে ঢের কথা! একদিন আমরা ওদের মাঠের পুকুরটায় দল বেঁধে স্নান করতে গিয়েছিলাম। ঐ ভেড়ের ভেড়ে নর্‌না ব্যাটা 'নিবুদ্ধি' নাহ'লে কখনো 'বাপের পুকুরে ডুবে মরে?' লোকে যা বলে ঠাট্টা করে, ব্যাটা তাই করলে। আমাদের সঙ্গে 'ফুটুনি' করে সাঁতার দিতে গিয়ে মাঝ পুকুরে মরেন আর কি ডুবে—এমন সময়ে ঐ হতভাগা নীলেটা পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছিল, লাফিয়ে জলে প'ড়ে নর্‌নাটাকে

ডাঙ্গায় টেনে তোলে। গোয়ালার ছেলে ভাদ্রমাসে দুধের হাঁড়ী মাথায় করে নদী পার হয়—কুমীরের মুখ থেকে 'মোষ' টেনে ডাঙ্গায় তোলে ওরা—ওদের পক্ষে এটা আর শক্ত কি ? ভদ্রলোকের ছেলে আমরা—আমরা কি ওই 'গুজরুটি হাতী' নর্‌নাকে তুলতে গিয়ে ডুবে মর্‌ব ? যাক্, সেই থেকে জমিদার বাড়ীর পুষ্যিএঁড়ে হয়েছেন, নরেনের সঙ্গে বেজায় ভাব জমে গেল, বাড়ীর সবাইও ওই জন্মে ওকে খুব ভালবাসে। চাষা—"

হরি প্রশ্ন করিল, "ওর বাড়ী কোথায় ? এ গাঁয়ে ত নয় !"

"কোথায় ন'পুকুর না কি একটা গাঁ আছে, সেইখানে বাড়ী। মা বাপ নেই, কোন্ এক সম্পর্কে-মামার স্কন্ধে ছিলেন, মামাটা গালমন্দ দেওয়ায় বাড়ী ছেড়ে রাগ করে এসে এইখানে ঢুকেছে ! মামাটারও আপদ গিয়েছে, একটা 'ধর্ম্মডাক' দিতে সে এসেছিল, ব্যাটা গেল না। যাবে কি, গোয়ালার ঘরের পুত্ গরু চরাতে চরাতে, দুধ দুইতে দুইতে মরতেন, এখানে লম্বাকোঁচা ঝুলিয়ে জমিদারের বাড়ীর ভাত মেরে জমিদারের ছেলের সঙ্গে এক পাঠশালায় বসে 'শিশুশিক্ষা' পড়ছেন। তারই দেমাক কত। আমরা বোধোদয় পড়া প্রথম ক্লাসের ছাত্তর, আমাদের সঙ্গে সমানে কথা কইতে আসেন !"

"দেখতেও তেমনি ষণ্ডা ! বাগে পেয়ে যে দু'ঘা দিয়ে দেব, তারও জো নেই।"

ভোলা এবার সগর্জ্জনে বলিল—"তাই বলে কি চিরদিনই

ওর সর্দ্দারি সইতে হবে? একা জোরে না পারি পাঁচজনে তো পারবই। একতায় কি না হয়; শুনেছি সেইতো—

'একতায় হিন্দুরাজগণ, সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন,
সে ভাবে থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধুনদী,
আসিতে কি পারিত যবন!'

জানিস্ তো?" সঙ্গীরা মূঢ়ের মত পরস্পরের পানে চাইতে লাগিল, বেচারারা শিশুশিক্ষা ছাড়িয়া সবে বোধোদয় ধরিয়াছে। 'পদার্থ' নামক প্রথম পাঠ শেষ করিয়া 'ঈশ্বর' নামক দ্বিতীয় পাঠে 'ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ' জানিয়া তিনি 'চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্' এই তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন, তাহারই মীমাংসায় ব্যস্ত আছে; তাহারা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফতে কবি রঙ্গলালের সহিত এখনো পরিচিত হয় নাই। কিন্তু রতন ঠকিবার ছেলে নয়, সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "ওরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ওরা এসব কোথা থেকে জানবে? আমি যখন আমার মামাদের গাঁয়ের পাঠশালায় অ আ শিখতাম, সেই পাঠশালায় ফাষ্টো কেলাসের ছেলেরা সুর করে বলত শুনেছি, 'কুমীরের মত তার খোঁপামারা অঙ্গ, নামটি খেজুর গাছ বাস করে বঙ্গ।'" ভোলা সগর্ব্ব হাস্যে রতনকে বাধা দিয়া বলিল, "আরে থাম না,—ও আমার পিসিমার ছোটো ছেলেটা পড়ে—ওর নাম পদ্যমালা। আর আমি যার কথা বলেছি, তার নাম পদ্যপাঠ! পদ্যমালা নয় পদ্যপাঠ, বুঝেছিস্। আমার পিসিমার বড় ছেলেরা পড়ে, 'সেই পদ্য-পাঠ!'" রতন তথাপি মৃদু মৃদু বলিল, "পদ্যমালাও খুব

ভাল বই। তাতে আরও কত আমের নামে কাঁঠালের নামে ঐ রকম সব ছড়া আছে, শোন যদি!" ভোলা এবার বিষম ধমক দিয়া বলিল, "তুই চুপ করত' রতনা! কেবল খেজুর আর আম কাঁঠাল নিয়েই মলি। নাম শুনে বুঝতে পারছিস্ না, কোন্ বইটা বড় ? ও হ'ল পদ্য-মালা, আর এ হল পদ্য-পাঠ!" "তা হলেই বা পাঠ, এও তো মালা"—বিপিন ও অন্যান্য মুগ্ধ বালকবৃন্দ রতনের এইরূপ উদ্ধত তর্কে চটিয়া গিয়া একযোগে চেঁচাইয়া উঠিল,—"চুপ কর বলছি রতন! হাতীর মত যেমন দেখতে, তেমনি বুদ্ধি কি না, কত হবে আর! ভোলা তুই কি বলছিলি বল ভাই। সেই যে ছড়াটা করে কি বললি—সেই—'আসিত যবন!' ভোলা সহসা বলিল, 'আসিত যবন' নয়, 'আসিতে কি পারিত যবন ?' এই যেমন ধরনা, আমাদের দলের হুটু, নন্দা, কানাই, নেপ্‌লা—ওরা যদি নীলের দলে না যোগ দিত, তাহ'লে কি আজ আমাদের তেমন দল ভাঙ্গত, না নীলে'র ভয়ে কাঁপতে হ'ত। ও যত বড় ষণ্ডাই হোক্ না কেন, আমরা দলসুদ্ধ ওর ঘাড়ে পড়তাম আর ওটাকে একেবারে পিষে ছেড়ে দিতাম। আমাদের একতা নেই বলেই না এমন হ'ল!"

সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভোলা আবার নব উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তাই বলে কি আমরা নীলের সর্দ্দারী এমনি করে চিরদিন মেনে চলব ? কখনো না। নষ্টচন্দ্রের রাতে রায়দের বাগান লুট করব বলে আমি দল জোট করলাম, কোথা থেকে নীলে এসে তিন তুড়িতে আমার দলের তিন ভাগ

ছেলেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বানের জলে 'বিত্তি' রেখেছে গাঁয়ের লোকে, বড় বড় কই মাগুর তার ভেতরে চড়্-বড়্ করছে, নীলে'র ভয়ে কোন ছেলে জলে নাববেনা—বলে, নীলমণি এতে বড় রাগ করে। গাছের কোন ফল পাড়া কি অন্য কিছু যাকে যা বলব, সে অমনি বায়না ধরবে 'ও লোকটা বড় গরীব, ওর ফল চুরি ক'রে কাজ নেই, ও মেয়েমানুষটার কেউ নেই, ভিক্ষে করে খায়, ওর ক্ষেতি করা উচিত নয়।' কই, এত কাল তো আমাদের দলে এমন সব কথা ওঠেনি কখনো। এসব নীলে'র কাজ, নীলে'র পরামর্শেই এরা সব এখন বিগড়ে গেছে!" সকলে একবাক্যে পুনরায় সায় দিল—"নীলেরই কাজ। এখন উপায়?"—"উপায় করতেই হবে। নীলের অধীন হ'য়ে আমরা কিছুতেই থাকব না। আমার পিসতুতো ভাইয়েরা পড়ে—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে—কে পরিবে পায়'—সবটা আমি জানিনা,—এও সেই পদ্যপাঠের ছড়া। সব শেষে কি একটা 'সাজ সাজ সাজ' বলে কথা আছে"—রতন বেচারা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু আবার সেই পদ্যপাঠের আবৃত্তি শুনিয়া চটিয়া গেল। বিরক্ত ভাবে বলিল, "তা যেন শুনলাম এখন, আসল কথাটা কি, কি করতে হবে?" ভোলা তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "এটুকু আর বুঝতে পারলি না! পাড়াগেঁয়ে ছেলের আর কত বুদ্ধি হবে"। অন্যান্য বালকেরাও যে কত বুঝিয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়া

কেহ রতনের মত পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করিল না। সকলেই রতনকে একবাক্যে টিটকারী দিল। তখন ভোলা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার গভীর মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দলসুদ্ধ বালকই পরম গম্ভীর হইয়া উঠিল।

২

পরদিন বৈকালে নীলমণির দল মাঠে সমবেত হইয়া হাডু-ডু খেলিতেছিল। এক একটি ব্যক্তি বা বালকের অনেকের উপর প্রভুত্ব করিবার মত প্রকৃতিদত্ত এমন একটি শক্তি থাকে, যাহাতে তাহার আধিপত্য লোকসমাজে শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই শক্তির জন্যই নীলমণি নবাগত হইলেও সে গ্রামের বালকবৃন্দের সর্দ্দার হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহার আরও একটি ক্ষমতা ছিল। এই কারণেই বালকেরা তাহার অত্যধিক অনুগত হইয়া পড়িত। নীলমণির গল্প বলিবার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং নিত্যনবক্রীড়াউদ্ভাবনী শক্তিরও সীমা ছিল না। এই দুই কারণেই তাহার দলস্থ বালকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল। তাহারা নীলমণির এমনি অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার অনুমতি পাইলে অতি অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিয়া ফেলিতে পারিত। এই ক্ষুদ্র বালক-সৈন্যকে সংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার বিষয়েও নীলমণির সেনাপতির উপযুক্ত গুণের অভাব ছিল না।

প্রত্যেক বালকের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অন্যায়ের বিচার এবং প্রত্যেক গুণের পুরস্কার দিয়া, প্রত্যেকের ন্যায্য স্বত্ব বজায় রাখিয়া, বিবাদ বিসংবাদ মারামারির মীমাংসা করিয়া নীলমণি নিজের সেনাপতি-পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানিত। জমিদার-পুত্র নরেনও এখানে অন্যান্য বালকের মতই তাহার অধীনতা স্বীকার করিত। সেও নরেনকে সকলের চেয়ে ভালবাসিলেও বিচারের সময় বিন্দুমাত্র পক্ষপাত দেখাইত না।

জগতে যেমন প্রত্যেক প্রবল শক্তির পার্শ্বেই তাহার একটা সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুও জন্মগ্রহণ করিয়া তেমনি সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি এই শিশু-সম্রাট্ নীলমণির প্রভুত্বের পার্শ্বে ভোলার দলও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও তাহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু বিষ বেশী, আদত গোখ্‌রো কেউটের 'ডাঁকা'! গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 'তুঁদে' দাঙ্গাবাজ বালক কয়টি লইয়াই সে দলটি গঠিত! দলপতি ভোলা একটি ক্ষুদ্র 'কালীকেউটে'র ছানা।

সবে খেলা আরম্ভ হইতেছে, এমন সময় ভোলার দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নীলমণি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিল এবং তখনি নিজকার্য্যে মন দিল। ভোলা দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল, "ওহে নীলচাঁদ! আমরাও খেলব।" নীলমণি তখন ওয়াটারলু ক্ষেত্রে বীর ওয়েলিংটনের মত সৈন্যসমাবেশে নিবিষ্টচিত্ত, ভোলার পানে না চাহিয়াই উত্তর দিল, "দেদার মাঠ পড়ে রয়েছে, স্বচ্ছন্দে খেলতে পার।" ভোলা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "মাঠ পড়ে আছে, তা আমিও

আশ্লেষা

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত বম্পাস টাউনে একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি 'কুটীরে'র ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লান্ত আমরা জন কয়েক মাতুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবে না। আবাস—'ভিলা' বা 'লজ'—তুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে 'কুটীর' নামে অভিহিত। ৺বৈদ্যনাথধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয় কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক একখানি 'কুটীর'ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই 'কুটীরে'র অভ্যাগতবর্গও স্থবেশা সঙ্গিনিগণ সমভিব্যাহারে শ্মশানে মশানে বিচরণ করিয়া, কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণাবদ্ধারাও বাঙ্গলা হইতে তুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তা-মাঠে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অন্তঃপুর চারিণী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সে কথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড় দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।) আকাশ

নক্ষত্র-বিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরের জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনারীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফোনের নানারসসমন্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুইদিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সে রাত্রে অগ্নি পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতে-ছিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্তদত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কি না, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম, এমন সময়ে কার্‌ষ্টেয়ার্স এবং বম্পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাহী সঙ্কীর্ণা শুষ্কশরীরা ‘যম্‌না-জোড়্‌’ নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল, সেই আলোক বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, ‘আলেয়া’—‘আলেয়া’। আমরা আগ্রহের সহিত সেই আলোকের নির্ব্বাণ-প্রজ্বলন এবং ইতস্ততঃ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে, যম্‌না-জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল ; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল, বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ ‘কান্‌হাইয়া জোড়্’ নামে ‘যম্‌না-জোড়’ অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণা একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যম্‌না-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময় গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, “ও তো ভুলোর আলো! ও তো মাঠে মাঠে এমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক’রেই বেড়ায়। ‘রাত-বিরাত্’ বা রাস্তা-ঘাটে ওদের নাম ক’রলেও বিপদ্ ঘটে! যেমন অপদেবতার নাম কর্‌লেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠান হন, তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম করলে বা ঐ আলো ধ’রে চল্‌লে, মরণ ত’ নিশ্চিত! তা’ছাড়া আবার ঘরে বসে রাত্রে ওর নাম কর্‌লে, কোন না কোন পথিক, সে রাতে ওর খপ্পরে পড়বেই!”—তাঁহার কথায় তখন আর আমাদের কাণ দিবার অবসর ছিল না। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে! হাত-পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া, ‘থিয়জফিষ্ট্-‘বন্ধু’ তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের

দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই 'আলেয়া' বলিতে দিবেন না,—এই তাঁহার পণ। বিজ্ঞের তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার রোখ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। বিজ্ঞ বলিতেছেন, "নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! কে বল্‌তে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটা ত খুব বেশী বড় নয়।" তাহার কথা তখন কে শোনে! ঐ আলোকটি যে ভৌতিক, ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এবিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। থিয়জফিষ্ট্‌ তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্‌ ও মহামান্য ওয়ালাস্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদবাবু, মণিলালবাবুর 'অলৌকিক রহস্য' এবং 'ভূতুড়ে কাণ্ডে'র গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের বিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ গল্পগুলো কালকের জন্যে রাখলে হত না?" শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। থিয়জফিষ্ট্‌ নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে 'ব্যূহিত' বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, বিজ্ঞের বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"কিসের ভয়!" তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া, বিজ্ঞ বিনীত ভাবে বলিলেন, "না—ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-বলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে,

তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক্।” তখন এ কথার সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিয়াছিলেন, এমন সময়ে নীচে হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ত্রিকূট দর্শনের সঙ্গী কার্‌ষ্টেয়ার্স-টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরেরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি-সমাচ্ছন্ন মুখে এ তত্ত্বও প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনিবদের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা করিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন, “রাত্রে ‘ভুলো’র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখ্‌লে ত’? তোমারা মান না কিন্তু আমরা এম্‌নি কত শত প্রত্যক্ষ ফল ফলতে দেখেছি।”

“এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের পৌঁছানো খবর আমাদের দিয়ে যেও।”—*

* তাঁহারা সত্যই সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহুকষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন! কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটিই সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন! তিনিও কোনও কার্য্যানু-রোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়াম্‌স্ টাউনে গিয়া হাজির হন! শেষে সেস্থান হইতে গাড়ী করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই ‘প্রহসন ভ্রান্তিকে’ তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।—কিন্তু তাঁহারা কেহই ‘আলেয়া’র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।

তাঁহাদের চাকরদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত 'ভুলোর আলো'র নাম মাহাত্ম্য এইরূপে সদ্যপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবি বন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকাডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হ'য়েছে! যদি কেউ এখন সাহস ক'রে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার, তা'হলে দেখতে পাও, যম্‌না-জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধুনী জ্বেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে সেই জ্বলন্ত ধুনীর কাঠটা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

বিস্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! বিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসিটুকুতেই আমরা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলাম! এমন সময় হাসি!—বলিলেন, "তা তো এখন কেউ যেতে পারছি না, অতএব"—

থিয়জফিষ্ট্, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন! মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয়

পাইলেই থিয়জফিষ্ট্—অভিজ্ঞতা, বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির ক্রোড়-দেশটি সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বলতে চাও, বল!" ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য ঃ

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা বিজ্ঞ বলিলেন, "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধুনীর গল্পই চলুক!"

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সে বহুদিনের কথা! দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘন বৃহৎ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীর বনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানের স্থানের উচ্চতা-রেখা তখন ঐ নন্দন-পাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রুক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাযথ-উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা—বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন 'পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়াম্‌স্ সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়াম্‌স্ টাউনের পত্তন করেন নাই; কার্‌ষ্টেয়ার্স বা বম্পাস টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর-অধিবাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বন মধ্যবাহিনী 'যম্‌না-জোড়্' ও 'কান্‌হাইয়া-জোড়'ও তখন এইরূপ বালুকাবিশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহারা 'দিগ্‌ড়ীয়া' পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি খর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের 'ঢল' নামিয়া নদীতে 'বুহা' আসিত, সেদিন সেই সঙ্কীর্ণা আখ্যাত পার্ব্বতীদ্বয়ের স্রোতোবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্ত হস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেওঘরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় থাকিতেন। তখনও দেওঘরে বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই! যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিল না যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুখে পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দূর-গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে 'দেও' ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচর সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও কেহ জানিত না; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী কিংবা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে ৺বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী ৺বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ

ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্দ্ধস্ফুট শতদল। শ্যামল শালপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি পলাশ, আকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজান্তে উঠিবার সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মাল্য ও প্রসাদ-স্বরূপ 'ত্যাগী বাবা'র হস্তে শিবসাগর-উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকীটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। তখন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহ্বল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শালশাল্মলী পলাশমধূক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি আপ্রান্ত নবপল্লবপুষ্পে ভূষিত; চ্যুতমুকুল, মধূক ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গান যেন বনদেবীরই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জরী-রবে এবং অঞ্চল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের ওষ্ঠস্পর্শী বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বন্য মহিষ, চমরীগাভী, কোথাও বা হরিণদল অদ্য যেন অধিকতর নির্ভয়ে—অধিকতর নির্ব্বিরোধভাবে—যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই

তরুণ যৌবনে পঠিত কুমার-সম্ভবের শ্লোকগুলা সহসা অদ্য তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত-সমাগমকে যেন অদ্য তাঁহার সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

"কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ॥
মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥"

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরে কাব্যের প্রতি এতখানি মোহ আছে? প্রকৃতির এই ঋতুবিপর্য্যয়ে সেই কাব্য-কথাই কেন তাঁহার মনে পড়িতেছে! তাঁহার অন্তর কি এখনও যে কোন ভোগসুখের উপরেই সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হয় নাই! তরুণ যৌবনের সুখলালসার লেশ এখনও কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে! অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই 'অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি'র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—"কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন

বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপল্য সংবরণ কর—নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ!”

সহসা সন্ন্যাসীর গতিরোধ হইল। দক্ষিণের ডালপালাগুলা বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিতদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন! এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব! দুই হস্তে সেই কণ্টকময় ঘনবনের শাখাপ্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্দ্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ-লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহারা সস্পৃহভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত-প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ঈষৎ আর্ত্তভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সে বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মোহ আসিয়াছিল! ভাবিতেছিলেন, “এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই,

নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ —অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অন্তরে কেন জাগিতেছে? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেবতা তুমি? হে কিশোর! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি! তোমায় কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে হইবে? কি কথা বলিতে হইবে?—কোন্ মন্ত্র সে?"

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি-স্থান-নির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাতপদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষে প্রশ্নভরা চকিত দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ!—"ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজ কো ডেরা হ্যায়?"

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্নাসীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন, —"আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমায় কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না!" সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন

সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল! তাহার সেই ঘনকৃষ্ণ বিলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্য্যস্ত কেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়েকটি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির নত করিয়া যুক্তকরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। "ঠাকুরজি! পাঁও লগে! আপ্ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?"—কি সুধাময় স্বর! সন্ন্যাসীর মনে হইতেছিল, কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী বালককে প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কিরূপে জানিল! সেই বা কে? এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল? বালক তাহার চক্ষু দুইটি সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা। তাহারা 'হরদোয়ার (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অদ্য কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন ৺বৈদ্যনাথজীর ধামে

পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু! আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকট অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ!

সন্ন্যাসী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ! ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবাগ্নিও হইতে পারিত?" বালক বলিল,—"তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না, কেন না কয়েকদণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইয়াছে; এক্ষণে দিবা অবসান-প্রায়! লোকালয়-প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন, হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে! ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।" সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা কোথায়?"

বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসঙ্কোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্যে বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায়, সন্ন্যাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি-সংযোগ হইল ; বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল !

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল ; এক্ষণে নিকটে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া ডাকিল, 'পার্বতি ! বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা ! আব্ কুছ্ ডর্ নেহি হ্যায় ! ঠাকুরজী সে মুলাকাৎ হুয়া, উন্‌নে আভি তুমকো দেখ্‌নে আতে হেঁ ! তুম্ আচ্ছা হো যাওগে, পুরুষোত্তম কো দর্‌শন করোগে, আব্ কুছ ডর্ নেই, ঠাকুরজী আগিহিন্।"

বালকের অকৃত্রিম সারল্যের এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল, যুক্তহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা ! পার্‌বতী তুমকো বহুৎ ফুকারা। অব্ হামারে আরজ্ ইয়া যোকি হামারা পার্‌বতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও। হামারে লিয়ে মেরা কুছ হর্‌জ নেই।

মেরি জনম্ মোগারৎ হো গিয়া বাবা, লেকীন্ পার্‌বতী কো লিয়ে—”

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—আর বিলম্ব করা উচিত নয়—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়! এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান! বালক ম্লানমুখে তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, “সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।” দীর্ঘোন্নত-দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত-যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজমনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, “এস পার্ব্বতীপ্রসাদ!”—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, “আপনার পদ্ম ফুলটি!” রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, “উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভার পড়িয়া থাকুক!” “না। বৈদ্‌নাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?” সন্ন্যাসী সম্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল, তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ-আঘ্রাণের সঙ্গে ‘আঃ’ শব্দ করিয়া ফুলটি কাণের

দেখতে পাচ্ছি। তোমার দলের সঙ্গে আমরা খেলতে চাই"। নীলমণি তখন সৈন্যরচনা স্থগিত রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোলার পানে চাহিয়া তাহার মতলবটা এক নিমিষেই বুঝিয়া লইল। নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে উত্তর দিল, "যদি ঝগড়া না বাধাও— তবে খেলতে পার ইচ্ছা করলে।"

"কি? আমি ঝগড়া বাধাই? ঝগড়া বাধাবার জন্যই বুঝি আমরা এসেছি!"

"সেই রকম তো বোধ হচ্ছে।"

"মুখ সামলে কথা কও; আমরা দাঙ্গাবাজ?"

"একশ বার! 'হক্' কথা বলতে আমি মুখ সামলাই না!"

"যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—বেটা চাষা—"

নীলমণি দৃপ্তচক্ষে চাহিয়া বলিল, "খবরদার ঝগড়া বাধিও না বলছি! তোমার গায়ে যে আমার চেয়ে বেশী জোর, তা নয়!" ভোলা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল! নীলমণি সেই রুষ্ট যুযুৎসু বৈরিবৃন্দের প্রতি দৃক্পাত মাত্র না করিয়া নিজের দলের প্রতি আজ্ঞা দিল—"খেলা আরম্ভ হোক"। ভোলার সহিত নীলমণির বচসা শুনিয়া মারামারির সম্ভাবনা বুঝিয়া বালকেরা একস্থানে জমায়েৎ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে নীলমণির আদেশে দুই দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট "কোটে" গিয়া দাঁড়াইল। হাডু-ডু শব্দ করিতে করিতে দলপতিই সর্ব্বপ্রথমে অপর দলের 'কোটে' প্রবিষ্ট হইয়া কাহাকেও 'মর্' করিবার চেষ্টা করায় অপর দলও সতর্ক হইয়া উঠিল, শত্রু—মারিয়া পলাইতে না পারে। তাহাকে 'কোটের' মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া

তাহার হাডু-ডু শব্দের দমটুকু ফুরাইয়া দিতে পারিলেই তাহার বীরত্বটুকুও ফুরাইয়া যাইবে। বেচারা মারিতে আসিয়া নিজেই 'মর্' হইবে। খেলা প্রথমেই খুব জমিয়া উঠিল। ভোলার দল ঈর্ষা-ক্রুর নেত্রে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, ভোলাও হতাশ না হইয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

যে ভাগে নীলমণি আছে, সেই ভাগের অপর পক্ষের এক বালকের 'মর্' লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবামাত্র ভোলা অপর পক্ষের বালকের হইয়া মহা তর্ক বাধাইয়া দিল। নরেনও সেই তর্কের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "কখনই নয়,—নেপাল নিশ্চয়ই দাস্থুকে মেরেছে।" দাস্থুর দলের প্রতিবাদের উপরেও ভোলার কণ্ঠ সকলের কণ্ঠকে ছাপাইয়া দিল—"দাস্থু 'মর্' হয়নি! মিথ্যা কথা এ! তোমরা এমনি করে নিজের কোলে ঝোল টানো"। দাস্থুর দলও সহানুভূতি-কারীর বাক্যে অস্ফুট সায় দিল। তখন নীলমণি অগ্রসর হইয়া ছু' এক বার সগর্জ্জনে 'থাম থাম' শব্দ করিতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; ভোলার পানে চাহিয়া সে রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তোমার মতলবটা হাসিল না ক'রে দেখছি ছাড়্বে না? ঝগড়া বাধাবেই নিতান্ত?"—নরেন সপরিহাসে বলিল, "আহা! অনেক করে দল জুটিয়ে আশা ক'রে এসেছে, করুক না একটু ঝগড়া, তুমিই বা তাতে ভড়কাও কেন?" তারপর বাম করতলের উপর দক্ষিণ হস্তের কনুই রাখিয়া দক্ষিণ করটিকে সর্পের ফণার আকারে ভোলার পানে সঞ্চালিত করিয়া বলিল, "হুর্-রে বক দেখেছ? রাঙ্গা বকের ছা দেখেছ?" নীলমণি

রক্তচক্ষে নরেনের পানে চাহিয়া ধমক দিল, "নরেন।" নরেন অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

ভোলাকে অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীলমণি শান্তস্বরে বলিল, "আমার দলের মীমাংসা আমিই করে নিতে পারি! দাস্থ 'মর্' হয়েছে না হয়েছে, সে আমিই ঠিক করে দেব। তুমি কেন এর মধ্যে গণ্ডগোল বাধাতে এসেছ ? খেলতে চাও খেল, নয়ত—"

ভোলা একেবারে বিসুবিয়সের মত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া উঠিল, "তোদের দলের সঙ্গে কুকুরে খেলা করে—শালা ভোমা গোয়ালা!"

"তুমি যে ঝগড়া বাধাতেই এসেছ, তা আমি তোমাদের দেখেই বুঝেছি। এখনো বলছি, চুপ করে খেলা দেখতে হয় তো ছ্যাখ, নয়ত"—

"নয়ত কিরে শালা চাষা!—তোর বাবার মাঠ, যে হুকুম চালাবি ?"—নরেন তীরবেগে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার বাবার মাঠ! বেরোও বলছি এখান থেকে।" ভোলা মুষ্টি বদ্ধ করিয়া নরেনের পানে ঝুঁকিয়া বলিল, "সাধ্যি থাকে বার কর।" নরেন নীলমণির পানে চাহিবার পূর্ব্বেই নীলমণি উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, "থাম, থাম বলছি তোমরা! কানাই, খেলা গুটোও,—চল আমরা বিলের ধারে খেল্ব! চল এগোও সব!" নিতান্ত অনিচ্ছুক অপ্রসন্ন ভাবে বালকের দল খেলা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। নরেন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও কাতর ভাবে নীলমণির পানে

চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কথা কহিতে সাহস করিল না।

নীলমণির দলের সঙ্গে নরেনকেও পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া রতন পূর্ব্বদিনের পদ্যপাঠ-বিদ্বেষ ভুলিয়া করতালি দিয়া গাহিয়া উঠিল, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে—কে পরিবে পায়।" নরেন মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া রতনের উপর পড়িবামাত্র ভোলার দলও নরেনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নীলমণি সবেগে সমবেত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নরেনকে ছিনাইয়া লইবামাত্র যুধ্যমান দল উন্মত্তের মত নীলমণিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ভোলা দলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল, "মার ঐ শালাকেই মার—এই দলের চাঁই! পিষে ফ্যাল্ একেবারে।" নীলমণি চাহিয়া দেখিল, সদলবলে নরেন আবার ছুটিয়া আসিতেছে। বোঁ বোঁ শব্দে চক্রাকারে দুই হাত ঘুরাইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নীলমণি সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল, "খবর্দ্দার! আমার দলের কেউ এগিয়েছ কি মরেছ! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক সব। এই বদ্‌মাস কটাকে আমিই দেখে নিচ্ছি!" নিঃশব্দে নীলমণির দল দাঁড়াইয়া সেই ক্ষুদ্র সপ্তরথী-পরিবৃত ক্ষুদ্র অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। দুই পাশের যুধ্যমান বালকগণ বাতাহত কদলীবৎ চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া টিপ্‌টাপ করিয়া পড়িয়া উলটি-পালটি খাইতেছিল। পতিত এবং আঘাতিত বালকগণ নীলমণির রৌদ্রমূর্ত্তি এবং দলবদ্ধ

বালকগণের রোষরক্তিম প্রতীক্ষা দেখিয়া বুঝিল—ব্যাপার বড় সাধারণ রকম হইবে না! তাহারা একে একে বঙ্গের চাণক্য-নীতি স্মরণ করিয়া পলায়ন দিল। কেবল ভোলা ও রতন বীরাগ্রগণ্যদ্বয় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল।

ভোলাকে সবেগে একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নীলমণি রতনকে কায়দা করিয়া ধরিল। ভোলাকে আবার নীলমণির দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া নরেন আর সহ্য করিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া প্রাণপণ বলে ভোলাকে নাসিকা লক্ষ্যে এক ঘুঁষি মারিতেই ভোলার নাসিকা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভোলা তখন নীলমণিকে ত্যাগ করিয়া নরেনের প্রতি ধাবিত হইল। রতনকে পরাস্ত করিয়া নীলমণি আসিয়া তাহাকে না আট্‌কাইলে নরেনের পক্ষে আজ বিষম ব্যাপার ঘটিত।

শেষে 'পরাভূত যুদ্ধে মহা অভিমানে—অভিমানী কুল-বীরর্ষভদ্বয়' রতন ও ভোলা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মাঠ ত্যাগ করিল।

৩

সন্ধ্যাকালে পুঁটে আসিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া নীলমণিকে ডাকিল, "ও নীলুবাবু! আপনাকে বড় দাদাবাবু যে ডাকছেন! যান একবার তাঁর কাছে।" বড় দাদাবাবু নরেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ। পুঁটে তাঁহার খানসামা। জমিদার বাড়ীর মধ্যে নীলমণির সেও এক শত্রু। মনিবের পূর্ব্বতন

চাকরেরা চিরদিনই নবাগত কেহ প্রভুর প্রিয় হইলে তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। পুঁটেও নীলমণিকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। ছোটবাবুর পরিত্যক্ত কাপড়টা জামাটার উপর তাহার দারুণ লোভ। সুরেন্দ্রনাথের প্রসাদি জামার লম্বা হাতা, অসঙ্গত ঝুল এবং বুক পীঠের বেড়ের আধিক্যে তাহাকে সংএর মত দেখাইত! কেহবা তাহাকে প্রশ্ন করিত, "পুঁটে তুই জামাটাকে পরেছিস না, জামাটাই তোকে পরেছে?" সুরেন্দ্রনাথ লোকটাও কিছু অসৌখীন, তাঁহার 'বুড্ডটে' পাড়ের দীর্ঘ কাপড়খানারও খানিকটা পুঁটেকে কোমরে পোঁটলা করিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু ছোটবাবুর লেসদার পাঞ্জাবি, হ্যাথাওয়ে ও লেড্‌লর বাড়ীর সার্ট যাহা তাহার মা ছোট ছেলেটিকে অত্যন্ত চেষ্টায় কর্ত্তার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়াও আনাইয়া সজ্জিত করেন, সেই জামা এবং সুন্দর সুন্দর পাড়ের মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতিগুলির উপর পুঁটের প্রাণ পড়িয়া থাকিত, কবে তাহা একটু পুরাতন হইবে বা একটু ছিঁড়িবে! এইগুলিই যে তাহার গায়ে এবং পরণে একেবারে 'ফিট্' হয়। কিন্তু নীলমণি আসা পর্য্যন্ত তাহা প্রায় নূতন অবস্থাতেই নীলমণির অধিকারভুক্ত হয়। শুধু এই নয়—ছোটবাবুর সঙ্গী বলিয়া নীলমণিকে সকলেই একটু অতিরিক্ত রকম ভালবাসে (তাহার যে কোন গুণের দ্বারা সকলের সে ভালবাসা পাইতেছে ইহা পুঁটে মানিতে চাহে না। ছোটবাবুর সঙ্গী হইতে পারিলে তাহারও এই 'অপগুণের ধাড়ী' নাম পাইতে হইত না! এই 'অপগুণের' ভিতরেই লোকে 'গুণের' সন্ধান পাইত,

তাহার এইরূপ মত)। নীলমণির এত দৌরাত্ম্য পুঁটে তাই সহিতে পারিতেছিল না।

নীলমণি গিয়া দেখিল, সুরেন্দ্রনাথ বেত্রহস্তে রুষ্টভাবে বসিয়া আছেন। ভোলা প্রমুখ বীরগণকে ত্রেতাযুগের 'ভগ্নদূতের' মত ধূলি-ধূসরিত দেহে সজল নয়নে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীলমণির ভারী হাসি পাইল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধের হতাবশিষ্ট বীরগণের কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল।

নীলমণিকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ একবার বেত্রগাছি মৃদুভাবে আছড়াইয়া লইলেন। বজ্র গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "নীলমণি! তুমি এদের মেরেছ?" নীলমণি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। "কথা কচ্ছনা কেন? উত্তর দাও, এদের মেরেছ কি না?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কেন?" "ওরা আমাদের দলের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়েছিল!" ভোলার দল স-কোলাহলে একেবারে বাধা দিয়া জানাইল যে, আর কাহারো সহিত তাহাদের মারামারি হয় নাই, কেহই দাঙ্গা করে নাই, কেবল একা নীলমণিই তাহাদের দলকে দল ঠেঙ্গাইয়াছে। নরেনের নামটা তাহারা সুরেন্দ্রবাবুর কাছে উল্লেখ করিতে সাহসী হইল না, পাছে তাহাতে মকর্দ্দমা কিছুমাত্র কাঁচিয়া যায়। "চুপ করে আছিস যে? উত্তর দে! দলের সঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে, না তুই একা এই ভেড়াগুলোকে 'গোবেড়োনে বেড়িয়েছিস?' বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টেও হাস্য 'সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না! নীলমণি নতমুখে ছিল, সে হাসি সে দেখিতে পাইল না,

কিন্তু বাদীপক্ষ তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিল, বুঝি মকর্দ্দমাই ফাঁসিয়া যায়! ভোলা অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার রক্তস্রাবী নাসিকা এবং রতন প্রমুখ বীরেরা কেহ ব্যথিত গণ্ড, কেহ বা আঘাত-প্রাপ্ত ওষ্ঠাধর, বেদনাগ্রস্ত অঙ্গ দেখাইয়া একযোগে বিষম করুণ-রসের তুফান তুলিয়া দিল! নীলমণি একটি প্রতিবাদও করিল না। তাহার কেবল ঘৃণা হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রনাথ রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। রক্ত চক্ষে নীলমণির পানে চাহিয়া দন্তে দন্তে চাপিয়া বলিলেন, "বল তোর কি বলবার আছে ?" নীলমণি নিঃশব্দেই রহিল। "রাস্কেল, তুই গোয়ালার ছেলে হ'য়ে বামুন কায়েতের ছেলেদের গায়ে হাত তুলিস্ ? রক্তপাত করিস্ ?"

সুরেন্দ্রনাথের হস্তস্থ বেত্র সজোরে নীলমণির অঙ্গে পড়িতে ও উঠিতে লাগিল। চার পাঁচবার আঘাতেও নীলমণিকে সেই 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব' দেখিয়া সুরেন্দ্রের রাগ আরও চড়িয়া গেল। যিনিই কখনো কাহাকেও প্রহার করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে প্রহৃত ব্যক্তি পলাইয়া গেলে বা কাঁদিয়া ফেলিলে দণ্ডদাতা তুষ্ট বই রুষ্ট হন না! ইহাতে তাঁহার প্রহারের প্রতি সম্মানও দেখান হইয়া থাকে এবং এই উপায়ে তাহারা উভয়েই বাঁচিয়া যায়। একজন পড়িয়া মার খায় এবং একজন অনবরত মারিতে থাকে, ইহাতে প্রহৃত ব্যক্তির অপেক্ষা প্রহার-কর্ত্তার বিপদ যে বড় কম হয়, তাহা নয়! উভয় পক্ষেরই এ বীরত্বের ফল শোচনীয় হইয়া পড়ে! দণ্ডিতের এইরূপ অন্যায় বীরত্ব দেখিয়া দণ্ডদাতা মাত্রেরই যেরূপ হইয়া থাকে, সুরেন্দ্র-

নাথেরও রাগ বাড়িয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ডোণ্ট্‌কেয়ার ! বটে ?" বেত্রে দ্বিগুণ জোর দিয়া সেটাকে চালিত করিলেন—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—নীলমণির বাহুর একস্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে অটল। রক্তের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুরেন্দ্রনাথের হস্তের বেতগাছটা যেন আপনা হইতেই ছিট্‌কাইয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ বার কতক তাহার পানে চাহিয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "চলে যা আমার সুমুখ থেকে।" চীৎকারে রোষের ভাব না ফুটিয়া যেন দোষীর আর্ত্তকণ্ঠের ধ্বনির মতই শুনাইল ! নীলমণি তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল।

ভোলার দল তখনো দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ সহসা লাফাইয়া উঠিলেন। পতিত বেত্রটা তুলিয়া লইয়া হাঁকিলেন, "বেরো, বেরো ভেড়ার দল এখান থেকে, নইলে—" হুড়মুড় করিয়া বেচারারা চক্ষের নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল। বড়বাবুর মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না তাহা সকলেই জানিত।

আঘাতিত স্থানটা জল দিয়া ধুইয়া হাত দিয়া চাপিয়া লইয়া নীলমণি নরেনের পাঠ কক্ষে ঢুকিবামাত্র আলমারির ভিতরের লুক্কায়িত স্থান হইতে নরেন বলিল, "কি হল ভাই ! মিটে গেল ?" নীলমণি অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "হুঁ।" "বড়দা আমায় খোঁজেননি !" "না !" "আমার ওপর রেগেছেন খুব—না ?" "তোমার নাম কেউ করেনি তাঁর কাছে।" "সত্যি নাকি ?

ভোলা—রতন—কেউ না ?” নরেন মহানন্দে আলমারির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবামাত্র নীলমণির আবৃত হস্তের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল—“ও-কিরে—ওকি ? বড়দা বুঝি তোকে মেরেছেন। লুকুচ্ছিস কেন, দেখিনা। এঁ্যা। সেই পাজীরা নিজেরা মারামারি করে শেষে তোকে এমনি করে মার খাওয়ালে।” নীলমণি একটু হাসিয়া বলিল, “যাদের যা বল। গায়ের জোরে হেরে ধূর্ত্তমি করে’ ক্ষমতা জাহির করতে এসেছিল।” তার পরে ভ্রূকুটি করিয়া দন্তে দন্তে চাপিয়া বলিল, “ঠকামি করে মার খাওয়ানোর চেয়ে গায়ের জোরের যে কতটা ক্ষমতা, তা একবার ভালকরে জানিয়ে দিলে তখন আর বদ্‌মাইসী করতে সাহসে কুলুবেনা। তাই-ই এবার করতে হবে দেখছি।” নরেনও সক্রোধে এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, “বড়দাদার কাছে যেতে যে আমার ভয় করে, নইলে আমি ওদের সব বদমাইসী ভেঙ্গে দিতাম। বড়দা কিছু শুনবার বুঝবার আগেই ধাঁ করে মেরে বসেন। আমি এই চল্লাম মার কাছে বাবার কাছে। ভোলাকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে শেষে গাঁ ছাড়া না করি ত আমার নাম নরেন রায় নয়। আমার কিছু ক্ষমতা আছে কিনা বেটাদের দেখাচ্ছি।” নীলমণি উত্যক্তভাবে বাধা দিল “বড়দের কাছে নালিশ ক’রে শাস্তি, এ-ও তোমার ওদেরই মত কাজ করা হবে”। “ওদের মত কাজ করা কিসে ? সত্যি যা তাই বলব। বেটারা আমায় পর্য্যন্ত মারবার উয্যুগ করেছিল, দেখেছিলে ত ?” নীলমণি হাসিয়া বলিল, “উয্যুগ কি ? তোমায়ও ত ক’ঘা মেরেছিল, তার

শাস্তিও তো তখুনি পেয়েছে।" "তোমার হাতে পেয়েছে আমার কাছে ত পায়নি, আমি এইবার দেখাচ্ছি।" "তোমার হাতে পেয়েছে বই কি ? সেই ঘুষিটা ?" নরেন ভীত ভাবে উত্তর দিল, "চুপ চুপ, বড়দা শুনতে পাবেন।" "সে ভয় করোনা ! সেটা আমার নামেই জমা-খরচের হিসাবে চলেছে, তুমি আর খুঁচিয়ে তুলতে যেও না, তাহ'লে লুকানো থাকবে না। বামুনের ছেলে বলে বড়বাবুর কাছে ওর ভারী মান দেখ্‌লাম ! চাই কি, তোমায় পর্য্যন্ত রেহাই না দিতে পারেন ! আমিই ওর বামনাই গিরি ফলানোর ভুল ভেঙ্গে দেব একদিন !" নরেন বুঝিয়া নীরব হইল।

ব্যাপার কিন্তু অন্যরকম দাঁড়াইল ! প্রভাতে উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথ পাঠশালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক বেলায় নরেন পাঠশালায় গিয়া দেখিল, নীলমণির দলের সাক্ষ্যসাবুদ লইয়া ফুল বেঞ্চে ভোলা ও রতনের বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহারা পাঠশালা হইতে তাড়িত হইয়াছে এবং তাহার দলস্থ বালকেরা শাসিত হইয়াছে। নরেন সানন্দে হাসিতে হাসিতে বাড়ী আসিয়া নীলমণিকে তোলাইল, "ওরে ওঠ ওঠ, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে"। নীলমণির যে জ্বর হইয়াছিল তাহা নরেন ভিন্ন কেহ জানিত না ! নরেন নীলমণির হাতে পটি বাঁধা এবং আর্ণিকার গন্ধ পাইয়া বলিল, "ওষুধ কে দিল তোকে ?" সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাভোগের পর একটু আরাম পাইয়া নীলমণির ঘুম আসিয়াছিল। নীলমণি তন্দ্রার মধ্যেই বলিল, "কে একজন এসে বেঁধে দিয়ে গেল, বড় দাদাবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

৪

নরেনের ভবিষ্যৎ বাণীই ফলিল। অপমানে এবং অভিমানে ভোলা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় যূথপতিশূন্য রতনের দল শীঘ্রই নীলমণির দলে মিশিয়া গিয়াছে। নরেন বলে, 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর হইয়াছে!' নীলমণি বলে, 'এর নাম লঘুপাপে গুরুদণ্ড' এবং রতন সহাস্যে হাততালি দিয়া বলে, "সে তার পিসির ছেলেদের কাছে ভাল করে পদ্যপাঠ মুখস্থ করতে গেছে।" রতনের স্বভাবের লোকেরা জগতের দণ্ড ও পুরস্কার উভয়েরই অতীত হইয়া শৃগালের মত অতি স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইতে থাকে।

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বালকগণ যুদ্ধবিহীন সৈন্যদলের মত ক্রমে যখন উত্তেজনা ও উৎসাহশূন্য হইয়া দিনে দিনে অলস হইয়া পড়িতেছিল, তখন সহসা একদিন একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে তাহাদের দলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সকলে নীলমণিকে ঘিরিয়া ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করিল—"নীলুদা, সত্যি তুমিও নরেনের সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছ?" নীলমণি সহাস্যে বলিল,—"হাঁরে, সত্যি বই কি!" "কেন তুমি যাবে কেন! নরেন বড় মানুষের ছেলে, সে ইংরিজি পড়তে যাচ্ছে তুমি ইংরিজি পড়ে কি করবে!" "ইংরিজি নাই বা পড়লাম, এমনি যাব।" "না না, তুমি তা যেওনা নীলুদা, তার চেয়ে তুমি এখানেই থাক, পুঁটে বড় খারাপ কথা বলল তোমায়!" "পুঁটে! বড় দাদাবাবুর সেই চাকর ছোঁড়াটা! কি বলেছে সে?" "সে বড় খারাপ কথা, শুনলে তুমি রাগ করবে।"

নীলমণির কৌতূহল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, "না না, রাগ করব না—বল।" "বলছিল যে নরেনবাবুর খানসামা হ'তে তুমি কলকাতা যাচ্ছ।" অত্যন্ত বিরক্তি এবং ক্রোধের মধ্যেও নীলমণি হাসিয়া বলিল, "ছুঁচো যেখান দিয়ে যায় তার গন্ধেই লোকে টের পায়।" সকলে এ উপমায় পরম কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে যাহার ভাণ্ডারে যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহা নীলমণির কর্ণে ঢালিতে ছাড়িল না। নুটু বলিল, "আমার ঠাকমা শ্রীক্ষেত্তরে ঠাকুর দর্শন করতে যাবার সময়ে কলকাতায় কুটুমবাড়ী উঠেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি কলকাতায় নাকি ভারী অন্ধকার, একটু বাতাস ও আলোর মুখ দেখতে পাওয়া যায় না, যত সব নোনা স্যাঁতা ধরা ইটের বাড়ী, আর তার মধ্যে এমন রাস্তা যে মানুষের চলতেও দম আটকে যায়। আবার বড় রাস্তায় এত সব মানুষ মারা যন্তরের গাড়ী, তাতে কেবলি লোক কাটা পড়ছে। তাদের এত শব্দ যে কানে তালা ধরে যায়, আর তাদের ধোঁয়ায় আকাশ পর্য্যন্ত অন্ধকার হ'য়ে থাকে। ঠাকমা বলেন, 'কলকাতায় কি মানুষ যায়, না—সেখানে থাকতে পারে, দম আটকেই মরে যেতে হয়।" নেপাল বলিল, "আমার পিসি গঙ্গাসাগরে 'চান' করতে গিয়ে কলকাতা দেখেছে। সে গঙ্গা আমাদের এ 'জলঙ্গীর' মত নয়। বিচ্ছিরি নোংরা ঘোলা নোনতা জল, তাতে এত কলের ইষ্টিম্বর চলছে যে, কুটোটি পড়লে দুখান হয়ে যায়। একটু সাঁতার দেবার কি থির হ'য়ে 'চান' করবার যো নেই, এই জল বাড়ছে আবার

কমছে। কলকাতার নদীতে চান করতে পর্য্যন্ত পারা যায় না।” ইত্যাকার বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ গবেষণা শুনিতে শুনিতে নীলমণির মন হইতে কলিকাতা যাওয়ার উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া আসিতেছিল, তথাপি কে যেন বলিল, “তা হলেই বা, নরেন তো সেখানে থাকবে। সে যেমন করে থাকবে আমিও তাই থাকব! নদীতে ‘চান’ করতে না পাই, বাড়ীতে করব। খেলবার মাঠ তো আছে, আরও ছেলেরাতো আছে।” মুটু বাধা দিয়া বলিল, “তবেই তুমি কলকাতার সব জেনেছ! মাঠ কোথায় পাবে? খালি গলি ঘুঁজি আর বাড়ীতে বাড়ীতে অন্ধকার। মাকালীর বাড়ী যেতে একটা নাকি গরাদ দিয়ে ঘেরা মাঠের মত আছে, তাতে ছেলে-পিলে পা দিলেই, হয় গোরা নয় ছেলেধরারা ধরে নিয়ে যায়। আর কলকাতার ছেলেরা কি আমাদের মত হা-ডু-ডু কি ডাণ্ডাগুলি খেলে! তারা কেবল লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে চুরুট টেনে বেড়ায়! শুনিস্‌নি, সবাই বলে যে, ‘ছোঁড়া যেন কলকাতার ফেরৎ!’” নীলমণি কতক বিশ্বাসে কতক অবিশ্বাসে বলিল, “ছেলেধরায় আর ধরতে হয় না—গোরাই বা শুধু শুধু ধরবে কেন! আচ্ছা, কলকাতায় মাঠ আছে কিনা, সেখানে ছেলেরা খেলে কিনা, বড় দাদাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করব।” কিন্তু নরেন্দ্রের মাতা যখন নরেনের বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহার জিম্বায় লাগাইয়া বাক্সে পূরিয়া দিতে লাগিলেন, তখন চকিতে তাহার পুঁটের মন্তব্য মনে পড়িয়া মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, সুরেনবাবুর বস্ত্রাদিও গৃহিণী এইরূপে পুঁটেকে জিম্বা দিয়া

দেন। নরেন সানন্দে উচ্ছ্বাসে মাতাকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিয়া বলিতেছিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার অত ভাবতে হবে না, আমরা দুজনে মিলে সব ঠিক রাখব।" মাতা ধমক দিলেন, "তুই ত সব পারবি। নীলুকে সব দেখিয়ে না দিলে হয়! নীলু! পুঁটে যেমন হুঁশিয়ার, তেমনি হয়ো!" "কি মা, কাকে পুঁটের মত হুঁশিয়ার করছ।" মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিকটে দেখিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বাহারে জামা ও বস্ত্রগুলি চাপা দিতে দিতে সন্ত্রস্ত স্বরে বলিলেন, "এই নীলুকে নরুর সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। নরু যে আলগা ছেলে, কোথায় কি হারায়ে থাকে, তার ত খোঁজও থাকে না ওর।" সুরেন্দ্রনাথ নীলমণির পানে চাহিয়া দেখিলেন, নীলমণি নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গণ্ড স্কন্ধ পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ মাতাকে ও ভ্রাতাকে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে বললে নীলমণি কলকাতা যাবে!" তাহার পরে নীলমণির পানে চাহিয়া যেন সান্ত্বনার স্বরেই বলিলেন, "তুমি এইখানেই থাকবে, নীলমণি, যেমন পড়ছ শুনছ তেমনি পড়বে খেলবে। কলকাতায় এখানকার মত কিছুতেই তোমার ভাল লাগবে না।" নীলমণি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া কৃতজ্ঞনেত্রে বড়বাবুর পানে চাহিল। সুরেন্দ্রের কথার উপরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা স্বয়ং কর্ত্তার সাহসেও কুলায় না—নরেন বা গৃহিণী তো পরের কথা। নীলমণি সম্বন্ধে আর কেহ উচ্চবাচ্য করিতে পারিবে না।

কলিকাতা যাত্রার জন্য সজ্জিত বাবুদের নৌকা সুরেন্দ্রনাথ ও নরেনকে লইয়া পরদিন প্রভাতে গ্রাম ত্যাগ করিল। নীলমণি

সদল বলে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নৌকা যখন ক্রমে দূর হইতে দূরে গিয়া বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইল, তখনো নীলমণি সেই দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষে তখনো নরেন্দ্রের ম্লান মুখ ও অশ্রুসিক্ত ঈষৎ রক্তাভ চক্ষু ভাসিতেছিল। জমিদার বাড়ীর লোকজন ভৃত্যবর্গ প্রভৃতি বাড়ী ফিরিয়া গেল, নীলমণি নড়িল না। ঘাটে স্নানার্থী লোকের সমাগম দেখিয়া ঘাট ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া বাঁধের উপর শ্যাম শষ্পাবৃত স্থানে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে তেমনি সেই নদীর বাঁকের দিকে চাহিয়া রহিল। সঙ্গীর দলও এদিকে ওদিকে নীরবে বসিয়া রহিল, তাহাকে কেহ ডাকিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইতেছিল না।

বহুক্ষণ পরে দলের অত্যন্ত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া নেপাল ডাকিল, “নীলুদা, নদীতে স্নান করে একেবারে বাড়ী যাই চল।” নুটু বলিল, “না—না, চল আজ কমল দ'য়ে স্নান করে আসি!” কোন কথা না কহিয়া নীলমণি নিঃশব্দে জলে নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে বিবিধ ভঙ্গীতে কেহ পাড়ের উপর হইতে সোজাসুজি লাফ দিয়া, কেহ ডিগ্‌বাজী খাইয়া, কেহ পাছু হইতে সবেগে ছুটিয়া নামিয়া জলে গিয়া পড়িয়া শান্ত নদীনীরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করভ-শিশুর ন্যায় মথিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। জলে পড়িয়াও তাহারা সেই কথামালা-কথিত রাজহংসের মত ‘উড্ডীন্ ডীন্ প্রতিডীন্ মহাডীন্ ডীন্-ডিনের’ সদৃশ বহু প্রকারের সন্তরণপটুতার পরিচয় দিতে লাগিল, কিন্তু নীলমণি তাহার শরীরটাকে আজ একটু নাড়িতেও পারিল না। জলে

গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া সে কেবলি ভাবিতেছিল, সে যদি এখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি নরেন্দ্রের নৌকা ধরিতে পারে না? পারে, হয়ত পারে, কিন্তু বড় দাদাবাবু কি মনে করিবেন? এই কতক্ষণ আগেও যে সে কলিকাতা যাওয়াকে অপমান বলিয়া মনে করিতেছিল। এই গ্রামের আকাশ বাতাস এবং প্রত্যেক বৃক্ষটি পর্য্যন্ত যে তাহার মনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে সুদৃঢ় স্নেহ বন্ধনে বাঁধিয়া বলাইতেছিল, 'কলকাতা যাব না। সেখানে আমার ভাল লাগে না!' কিন্তু এই দুদণ্ডের মধ্যে আবার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! তাহার অধীর মন তাহাকে কেবলি তাগাদা দিতেছিল, "এখনো নদীর ধারে ধারে ছুটিলে নিশ্চয় নৌকা ধরা যায়, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু কি ভাবিবেন!" নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি জমিদার বাটী অভিমুখে চলিল।

সেই 'কমলদহ' বিল, সেই মাঠ, সেই গ্রাম, সেই বহুদিনের নদী, বালকের দল—সবই তো তেমনি আছে! কেবল একটি লোকমাত্র চলিয়া গেলে যে চিরদিনের সবও এমন করিয়া মুছিয়া ধুইয়া এক হইয়া যায়, বায়ু শরীরকে স্পর্শ করে না—আলোর ঔজ্জ্বল্য শক্তি নিবিয়া যায়, আকাশ একটা কালো পরদার মত পৃথিবীর মাথার ওপরে এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত ঢাকিয়া সব আনন্দ সব অনুভব—বুঝি নিজের জীবনের অস্তিত্ব বোধকেও যে এমন করিয়া ঢাকিয়া দেয় এ তাহার বালক বুদ্ধির অগম্যই ছিল। আজ তাই সে অবাক্ হইয়া ব্যথিত মুখে প্রত্যেক জিনিষের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সঙ্গীরা খেলার জন্য

জমায়েৎ হইয়াছে, চিরদিনের মত নীলমণিকেই তাহারা অগ্রবর্ত্তী করিতেছে, কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টায় দু এক 'পার্ট' খেলিয়াই শ্রান্ত দেহে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার শরীরটা ভাল নেই আজ। তোরা খেল!" মূঢ়ের মত বসিয়া বসিয়া কেবল সে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। কেন এমন হচ্চে? কেন খেলতে পারছি না।

৫

যেদিন নরেনের হাতের লেখা একখানি চিঠি নীলমণির নামে আসিল, সেদিন নীলমণির তরুণ জীবনে আবার একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইল! একটা কাগজে লেখা গোটাকতক আঁকা বাঁকা অক্ষরে "তুমি কেমন আছ ভাই! আমরা ভাল আছি। তোমার জন্য আমার মন কেমন করিতেছে" এই শব্দগুলার একি ক্ষমতা! সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও যে সে তাহাদের এই ছাড়াছাড়ির দুঃখের সান্ত্বনা পাইতেছিল না, সহসা একখানা কাগজে গোটাকতক অক্ষর আসিয়া কি অমৃত স্পর্শে তাহার সে চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে! অনাস্বাদিত এ কি সুখ!

ইতিমধ্যে নীলমণি পাঠশালায় যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, চালাঘরের হট্টগোলের মধ্যে কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া পা দুলাইয়া পড়া মুখস্থ করা বা ছোট বড় সকল বালকদের উপর সর্দ্দারি করার ক্ষমতায় সে আর কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছিল না। রতন, নেপাল, মুটুরাও মাঠে ঘাটে আর তাহার নাগাল পায় না।

দু একদিন অপেক্ষা করিয়া শেষে কেহ কেহ সাহসপূর্ব্বক জমিদার বাড়ী গিয়া সন্ধান লইয়া দেখিল, নীলমণি নরেনের পড়িবার ঘরের এক কোণায় একখানা ছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ লইয়া অত্যন্ত মনঃসংযোগের সহিত 'অঙ্গদ রায়বার', 'কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ' পড়িতেছে। "পায়ে চোট লাগিয়া ব্যথা হইয়াছে, খেলিতে পারিব না" বলিয়া নীলমণি তাহাদের ফিরাইয়া দিত। রতনেরই ইহাতে 'একাদশে বৃহস্পতি' যোগ ঘটিয়া গেল। সে-ই এখন বালকদলের 'কমাণ্ডার ইন্ চিফ্' পদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িয়াও যখন আর সময় কাটিতে চাহিত না, তখন নিষ্কর্ম্মা নীলমণি অগত্যা উঠিয়া নরেনের পরিত্যক্ত বইগুলা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া গুছাইয়া রাখিত, কোন সময় বা ঘরটা পরিষ্কার করিত। নরেনের প্রিয়পাত্র বলিয়া এতদিন সকলেই তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত, কিন্তু আজ নরেন দূরে থাকায় চাপ্রাস হারাণো চাপ্রাসীর ন্যায় নীলমণির অস্তিত্ব সকলকে যেন একটু বিরক্তই করিয়া তুলিত। নরেন্দ্রের মাতা তাহাকে নরেনের ছায়ার মত জানিয়া বরাবরই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেই নরেনের সঙ্গেই তাহাকে কলিকাতা গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং সুরেন্দ্রের কড়া শাসনে তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহাকে এইরূপ অনাবশ্যক প্রতিপাল্যের মত চিরদিনই রাখিতে হইবে বুঝিয়া তিনিও অন্তরে যেন তাহাকে একটু গলগ্রহের মতই বোধ করিতেছিলেন। অবশ্য কর্ত্তব্যবন্ধনের মধ্যে পড়িলে অনুগ্রহের মূর্ত্তিও নিগ্রহের রূপ ধারণ করে। কিন্তু যেদিন

হইতে সে তাঁহার খুকীকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—নানাপ্রকারে তাহাকে খেলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে তিনি নীলমণির প্রতি নষ্ট স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছেন। এই ছোট বোনটি নরেনের অত্যন্ত প্রিয়,—নরেন তাহাকে সর্ব্বদাই আদর করিয়া কোলে করিত।

নরেনের পত্রখানি লইয়া সেদিন নীলমণি যেন বিব্রত হইয়াই পড়িয়াছিল। সমস্তদিনে বার পঁচিশ পড়িয়াও পড়া শেষ হইতেছিল না এবং প্রতিবারেই মনে হইতেছিল, ভাল করিয়া পড়া হয় নাই ; আর একবার পড়িতে হইবে। পত্রখানা কোথাও রাখিয়াও সোয়াস্তি হইতেছে না, এঘর হইতে ওঘরে যাইতে হইলেও সেখানাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইতে হইতেছে এবং তাহাতে পত্রখানা দুম্‌ড়াইয়া মুচ্‌ড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে মাঝে মাঝে সেখানাকে বাহির করিয়া হস্তমার্জ্জনের দ্বারা তাহার অঙ্গের কোঁচকানো দাগগুলি বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া বৈকালে পত্রখানা লইয়া সে বিলের ধারের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। বালকের দল সহজে যে এখানে খেলিতে আসে না, তাহা সে বিশেষরূপেই জানিত। তাহাকে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাহার পরিচিত গোটা দুই কুকুর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গ লইল এবং সাহ্লাদে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কখনো মৃদু কখনো দ্রুত গতিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। নীলমণি বহু চেষ্টায়ও তাহাদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা ক্ষান্ত হইল।

বিলের ধারে একটা পতিত বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া সে পত্রখানা চোখের উপর বিস্তৃত করিয়া ধরিল, কিন্তু ক্ষণপরে তাহাতে যেন পড়ার অসুবিধা হইতেছে এই ভাবে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর শুইয়া পড়িয়া সেখানাকেও ঘাসের উপর পাতিয়া লইয়া এক একটি অক্ষরের উপর দৃষ্টিকে বহুক্ষণ ধরিয়া নিবদ্ধ রাখিতেছিল। যেন তাহার মধ্যে কি দুরূহ তত্ত্বই নিহিত আছে, যাহা বুঝিয়া না পড়িলে অর্থ বোধ হইবে না। ক্রমে গোধূলির আলোকও জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাখালেরা গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিবার সময় "নীলমণিদা"কে তদবস্থায় দেখিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর না পাইয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের বিগ্রহ-মন্দিরে আরতির শব্দ উঠিল, পশ্চিম আকাশের শেষ রক্তাভাটুকুও মিশাইয়া যাইতেছিল, অক্ষর আর একটিও চোখে ঠেকে না, কুকুর দুটার ক্ষুব্ধ আহ্বান-শব্দে তখন নীলমণি মুখ তুলিয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল সাঁজের তারা অনেকক্ষণ উঠিয়া পড়িয়াছে। তখন পত্রখানা সযত্নে মুড়িয়া হস্তে লইয়া নীলমণি বাড়ী অভিমুখে চলিল।

অতঃপর পত্রখানা যে কোথায় রাখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার মহা চিন্তা পড়িয়া গেল। নরেনের পরিত্যক্ত ও সম্প্রতি তাহার অধিকারভুক্ত একটা কাঠের বাক্সমাত্র তাহার সম্পত্তি, কিন্তু সেটার মধ্যে রাখিতে মন সরিল না। কাঠের বাক্স হইতে আলমারির পাশ, তথা হইতে কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গি হইতে মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত হইতে নরেনের পুরাতন বইখানার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াও যখন

তাহার মন শান্তি পাইল না, তখন সে পত্রখানা নিজের মাথার বালিসের তলায় চাপিয়া রাখিয়া তাহার উপর মস্তক দিয়া শয়ন করিল। শুইয়া কিছুক্ষণ পরে মনে পড়িল, নরেন না তাহাকে পত্রের জবাব দিতে বলিয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার পত্রখানা টানিয়া লইয়া আলোর নিকটে গিয়া সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া অক্ষরগুলি একটি একটি করিয়া পড়িয়া দেখিল যথারীতি "পত্র পাঠ উত্তর দিবে" লেখা আছে বটে। উত্তর লিখিতে কিন্তু কাগজেরই যে অসংস্থান। মাটির দোয়াতের ভিতরে ভূষার কালিতে ভিজানো ন্যাক্ড়াখানা নীলমণির পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করার সঙ্গেই শুকাইয়া উঠিয়াছে, তবু নীলমণি তাহাতে একটু জল দিয়া খাগের কলম দিয়া ঘুঁটিয়া একটু কালি প্রস্তুত করিয়া লইল, কিন্তু কাগজের কি উপায় হয়? ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা সে মহাভারতের মলাটের উপর পাতলা মলিন শাদা পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পত্র লিখিতে বসিল, কিন্তু সেই তৈল-চিত্রিত পাতলা কাগজখানির উপর স্বল্প ভূষা-মিশ্রিত জলভাগবহুল মসী কোন মতেই দাঁড়াইতে চাহিতেছিল না! বহু চেষ্টার পর নীলমণি ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

নীলমণি যখন এইরূপ মসীযুদ্ধে ব্যাপৃত, এমন সময়ে নরেনের মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নরেনের ঘরটির সজ্জিত পরিষ্কৃত অবস্থা দেখিয়া (যাহা এতদিন তিনি না পরিষ্কার করাইয়া দিলে তাঁহার মতে 'আঁস্তাকুড়' হইয়া থাকিত) প্রসন্ন মুখে ডাকিলেন "নীলু, কি কচ্ছিসরে?" নীলমণি তটস্থ

ভাবে স্থির হইয়া বসিল। মাতা নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নরেনের চিঠির উত্তর লিখছিস বুঝি? (নীলমণি যে নরেনের পত্র পাইয়াছে নীলমণির উক্ত সব ব্যাপারে সে খবর মায় কর্ত্তার কাছে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে) আ কপাল, ঐ বুঝি কাগজ! আর ঐ কালি! ওতে কখনো চিঠি লেখা হয়। যা সরকারের কাছে গিয়ে একখানা কাগজ আর তার দোয়াতটা চেয়ে আনগে যা"। নীলমণি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া সরকারের সন্ধানে ধাবিত হইল, কিন্তু সরকারের হুঃ! 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ,'—'ঘুটে কুড়ুনির বেটা সদর নায়েব,' 'অতি দর্পে হত হইল লঙ্কার রাবণ। অতি মানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন। অতি দানে বলীর পাতালে হইল ঠাঁই, অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিহ ভাই?' প্রভৃতি বচন শুনিয়া অপমান-আরক্ত মুখে ফিরিয়া আসিয়া গৃহকোণে প্রবেশ করিলে গৃহিণী বলিলেন, "কই, কালি কাগজ আনলিনে?" গৃহিণীও নীলমণিকে দিয়া নরেনকে কলিকাতার গাড়ীঘোড়া ভরা রাস্তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য গোটা কতক কথা বলিয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। এক্ষণে নীলমণিকে রিক্তহস্তে ফিরিতে দেখিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "সরকার বুঝি দিলে না? আমার নাম করেছিলি?" "না"। "যা, আমার নাম করে চেয়ে আনগে।" নীলমণিকে গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া বলিলেন, "তবে থাক কাল লিখিস্।" গৃহিণী চলিয়া গেলেন, কিন্তু নীলমণির তো কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলিবে না। আবার সে ধীরে ধীরে সরকারের

নিকট গিয়া গৃহিণীর আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বহু বক্র উক্তি সহ্য করিয়াও কালি কাগজ লইয়া আসিল! এরূপ সহিষ্ণুতা তাহার জীবনে এই প্রথম। পর দিন গৃহিণী তাহাকে নরেনের ঠিকানা বলিয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওরে পাগলা, পত্তর বুঝি অমনি যায়? ওতে ছুটো করে পয়সা ট্যাক্‌স দিতে হয়। সরকারের সঙ্গে তো তোর বনে না, নইলে সেই খান থেকে আমার নাম করে 'ইষ্টাম্প' চাইতে বলতাম। তা এই ছুটো পয়সা নে! গাঁয়ে যখন ডাকওয়ালা আসবে, তার কাছ থেকে 'ইষ্টাম্প' কিনে নিস্।" মাথা হেঁট করিয়া নীলমণি হাত পাতিয়া পয়সা লইল, এও তাহার জীবনে এই প্রথম।

৬

পুঁটের দূরদর্শী ও জ্ঞানগর্ভ বচনেরই প্রামাণ্য ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। নীলমণি নরেনের নিকটে না গিয়াও ক্রমে ক্রমে জমিদার বাড়ীর সর্ব্বসাধারণের নিকটে এই এক বৎসরে একটি বিশ্বস্ত কর্ম্মদক্ষ ক্ষুদ্র খানসামাতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর ঐরূপ স্নেহানুগ্রহ নীলমণিকে ক্রমে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনে সচেষ্ট করিয়া তুলিয়া খুকীর বাহনে পর্য্যবসিত করিয়াছে। জলে বাস করিয়া জলজন্তুদের সহিত বিবাদ রাখা চলে না। যখন নীলমণির এই জমিদার বাড়ী ও তাহার প্রিয় শিষ্য হরে রাখালের কুঁড়েঘর তাহার কাছে সমানই ছিল, তখন সে কাহাকেও খাতির করিয়া চলিত না! নরেনের উপরও সে তাহার শাসনদণ্ড চালাইত। কিন্তু আজ পাছে তাহাকে কেহ

এ স্থান হইতে চ্যুত করে, সেই আশঙ্কা ক্রমে তাহাকে সকলের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত করিয়াছে! এ বাড়ী ছাড়িবার আর যে তাহার উপায় মাত্র নাই। এমন কি, চির শত্রু পুঁটেও যদি সেখানে থাকিত তো নীলমণি তাহারও সহিত নিশ্চয় সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া ফেলিত। সরকার মহাশয়ও এখন সেই "ভেমো গোয়ালার ছেলের ষাট বৎসর বয়স হবার পূর্ব্বেই বুদ্ধির গুণে সে যে সাবালক হইয়াছে," একথা প্রসন্ন মুখেই স্বীকার করেন! নীলমণির নামে নরেনের পত্র আসিলে আর সেখানা লইয়া তিনি নীলমণিকে নির্দ্দয় ভাবে কষ্ট দেন না! "সরকার মশায়, আমার চিঠি বাক্সের মধ্যে পূরে রাখলেন, দিলেন না!" নীলমণির ইত্যাকার অভিযোগে গৃহিণীর রুষ্ট আদেশ আসিয়া তাঁহার চতুর্গুণ রুষ্ট হস্ত হইতে পত্রখানা নীলমণির মুখের উপরে লোষ্ট্রের আকারে পতিত হয় না। এখন তিনি নিজেই হাসিমুখে ডাকেন, "নীলুচাঁদ, ছোটবাবু তোকে পত্র দিয়েছেন রে!"

প্রত্যহ অম্লান মুখে সমস্ত দিন সকলের অশেষ ফরমাইস খাটিয়া যে দিন তাহার পত্র আসিবার সম্ভাবনা বুঝে, সেদিন সে বৈকালে খুকীকে স্কন্ধে লইয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়ে, মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামান্তর হইতে এইপথ দিয়া ডাক-হরকরা সে গ্রামে আসে। খুকীকে খেলা দিতে দিতে অধীর আগ্রহে সে পুনঃ পুনঃ মাঠের দিকে চাহিতে থাকে, গ্রামের রাখাল বা কৃষাণ গরু তাড়াইয়া এদিক হইতে ওদিকে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে। ক্বচিৎ গ্রামান্তরগামী তু' এক জন পথিক

পথ বাহিয়া আসে বা চলিয়া যায়! এমনি করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড ধরিয়া প্রতীক্ষার পর সহসা সেই প্রতীক্ষার বস্তু নিকটে আসে! নীলমণি তখন খুকীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে হরকরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করে। পিয়ন জমিদার বাড়ী গিয়া স্কন্ধের ব্যাগ নামায়, সরকারের নিকটে একে একে সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি দিতে থাকে, নীলমণির ব্যাকুল দৃষ্টি কেবল সেই খামগুলির উপরে বিদ্যুতের মত ঘুরিতে থাকে—যদি সেই প্রিয় হস্তাক্ষরটি সে পাইবার পূর্ব্বেই দেখিয়া লইতে পারে। চশমা চোখে সরকার মহাশয় সমস্ত পত্র একে একে দেখিয়া লইতে লইতে যেমন মুখ তুলেন অমনি নীলমণির সমস্ত বুকটা বহুক্ষণ ব্যাপী প্রতীক্ষায় উদ্বেগপূর্ণ বিসম তালে ধ্বনিত হইতে হইতে সহসা একেবারে লাফাইয়া উঠে। তার পরে সরকার মহাশয়ের সহাস্য স্বর "নীলমণি, এই নে!" তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীলমণির যেন বাহ্য জ্ঞানও থাকে না। আর যে দিন সরকার মহাশয় মাথা তুলেন না—পত্রগুলি একে একে গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া যান, সেদিন আর সে উঠিয়া খুকীকে ঘাড়ে লইয়াও অন্দরে ঢুকিতে পারে না। কাহারো দ্বারা তাহাকে গৃহিণীর নিকট প্রেরণ করিয়া নিঃশব্দে মাঠে চলিয়া যায়। বহুক্ষণ তথায় কাটাইয়া রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে নিজস্থানে গিয়া শুইয়া পড়ে। হায়, কাহার জন্য আজ তাহার এ দাসত্ব! কোন্ সুখের আস্বাদ তাহাকে দিন দিন এইরূপে বন্দী করিয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করিতেছে! এবাড়ী ছাড়িয়া গেলে কি আর নরেনের সহিত তাহার

কোন সম্বন্ধ থাকিবে! তাই, সে সেকথা মনে করিতেও শিহরিয়া উঠে!

একবৎসর পরে একদিন শরতের প্রভাতে গৃহিণী বলিলেন, "ওরে নীলু, কাল তোর দাদাবাবুরা বাড়ী আসছে।" সে দিন ও রাত্রিটা নীলমণির কাটানো অসাধ্যই হইয়াছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া সে গৃহিণীকে বলিল, "মা, আমি ঘাটের ধারে যাচ্ছি!"

"এত ভোরে গিয়ে কি করবি ? তাদের আসতে হয়ত বেলা দুপুরই হ'য়ে যাবে!"

নীলমণির অধীর অন্তর নিষেধ মানিল না! ছুটিতে ছুটিতে সে ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল। জমিদার বাড়ীর লোকজন ঘাটে বাবুদের প্রতীক্ষার্থ আসিলে নীলমণি ঘাট ত্যাগ করিয়া নদীর কূলে কূলে অনেক দূর চলিয়া গিয়া একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। কত নৌকা শাদা পাল ফুলাইয়া আশ্বিনের খরবেগশালী নদীস্রোতের ভাটার টানে গা ছাড়িয়া দিয়া প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের লইয়া গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া চলিয়াছে! মাঝিরা আনন্দে আগমনী গাহিতেছে। নৌকার মধ্যেও আজ আনন্দভরা কণ্ঠের গুঞ্জন! সহসা এক সময়ে নীলমণি চমকিত হইয়া ডাকিল—"স্বরূপ দাদা নাকি ?" নৌকা হইতে স্বরূপ মাঝি সাড়া দিল—"হাঁরে নীলুভাই!" সে পূর্ব্ব রাত্রে বাবুদের আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। আনন্দে নীলমণি আঘাটা ভাঙিয়া নিম্নে নামিতে লাগিল। নৌকা হইতে মুখ বাহির করিয়া সুরেন্দ্র বলিল "নীলমণি নাকি ?" "হাঁ, নরেনবাবু কই ?"

নরেন্দ্র ছইয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সানন্দ বিস্ময় কণ্ঠে বলিল, "এতদূরে এসেছ কেন? ঘাট যে এখান থেকে অনেকটা।" নীলমণি উত্তর দিতে পারিল না, কেবল নির্ব্বাক আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিল, নরেন এই একবৎসরে কত খানি বড় হইয়াছে, বুঝি কত সুন্দরও হইয়াছে—কণ্ঠের স্বরটাও এতদিন এত মিষ্ট ছিল না! সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নৌকা লাগাত' স্বরূপ, উঠে পড় নীলু!" স্বরূপের বিরক্ত মুখভঙ্গী দেখিয়া নীলমণি কুন্ঠিত ব্যস্ততার সহিত "না না, আমি হেঁটেই যাব এটুকু" বলিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিল।

ঘাটে নৌকা পৌঁছিলে বাবুরা নামিয়া টমটমে আরোহণ করিলেন। জিনিষ-পত্র গো-শকটে বোঝাই হইল। নরেন ডাকিল, "এস নীলমণি!" নীলমণি চাহিয়া দেখিল, সরকার মহাশয় টমটমের পশ্চাতে উঠিয়া বসিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল, "আপনারা গাড়ী চালান, দেখুন হেঁটে আমি ওর সমান যাব।"

মহানন্দে দিন কাটিতে লাগিল। পুরাতন সঙ্গীদের আজ নীলমণির মনে হইলে মাঠে গিয়া খেলার প্রস্তাব করিবামাত্র নরেন তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "ছ্যাঃ—ওদের সঙ্গে আবার খেলে? সেই ডাণ্ডাগুলি আব হাডু-ডু তো? রামঃ! আমরা এখন ক্রিকেট খেলি! আমাদের স্কুলে তিনটে পার্টি আছে, এ-টিম্, বি-টিম্, সি-টিম্। বড় ছেলেরা এ-টিম্, আমরা বি-টিম্, আমাদের ছোটরা সি-টিম্। আমার একজন বন্ধু সেই যার কথা তোমায়

লিখি—সেই অখিল বলে ছেলেটি সে যা 'রান্' দিতে আর খেলতে পারে, উঃ! তার নাম রেখেছি আমরা প্রিন্স রঞ্জিত সিংজি" ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে নীলমণির বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা লাগিল। অখিলনাথের নামে আর কোন দিনতো এরূপ কষ্ট হয় নাই।

নরেন্দ্র বাড়ী আসার পর আর কেহ নীলমণিকে কাজ করিতে ডাকিত না, কিন্তু নরেন্দ্র একদিন নীলমণিকে তাহাদের স্নানের বস্ত্র লইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, "তুমি পুঁটের কাজ করছ কেন?" নীলমণি একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। আর একদিন খুকীকে তাহার স্কন্ধে দেখিয়া বলিল, "তুমি ওর বাহন হয়েছ যে দেখছি?" মাতা উত্তর দিলেন, "খুকী তো এখন ওর কাছেই সর্ব্বদা থাকে।" খুকী তখন নীলমণিকে ঘোড়া হইতে অনুরোধ করিতেছিল। বিরক্ত হইয়া নরেন বলিল, "কেন, ওর ঝি কি হ'ল? "নীলুই ওকে খেলা দেয়, তাই ঝি আর রাখিনি!" "কেন, ওকি তোমাদের চাকর? বারণ করে দিচ্ছি, ওকে দিয়ে তুমি এসব করিও না।" "তবে ও কি করবে রে পাগলা?" "যা খুসী করবে। ও আমার ভাইয়ের মত, ওকে আমরা কত ভালবাসি,—বড়দা বাসেন, আমি বাসি, তা কি তোমরা জান না?" লজ্জায় আনন্দে নীলমণি সেখান হইতে সরিয়া তাড়াতাড়ি খুকীর দুধের বাটী ধুইতে বসিল। আজ এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ জগতে নাই, যাহা সে পারে না! আজ তাহার সমস্ত অধীনতা এমনি সার্থক হইয়া গেছে। কেবল সে সুরেন্দ্রনাথের নিকটে যাইতে কেমন

সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তিনি একদিন গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন,—"নীলমণি, শুনলাম তোমায় কেউ জোর করিয়ে পাঠশালা ছাড়ায়নি, তুমি নিজেই ছেড়েছ। জড়িতকণ্ঠে নীলমণি উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কেন পাঠশালা ছাড়লে ?" "ভাল লাগত না।" আর তিনি কিছু বলেন নাই, সেই হইতে নীলমণি পারত পক্ষে আর তাঁহার সম্মুখে যাইত না; তাঁহার সম্মুখে কোন কাজ করিতে তাহার কেবল কেমন যেন লজ্জা করিত।

ক্রমে পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেলে নরেনরা কলিকাতা যাত্রা করিল। নীলমণি এবারে তাহার সঙ্গে নিশ্চয় কলিকাতা যাইবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু নরেন সে সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্য না করায় নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল একটি বেদনা তাহার ব্যথিত হৃদয়কে যেন অধিকতর নির্ব্বাক করিয়া কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল।

৭

আবার এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নীলমণি এখনো জমিদার বাড়ীতেই একভাবে দিন কাটাইতেছে। অধিকন্তুর মধ্যে এখন সে দুই তিনখানা পত্র লিখিয়াও নরেনের উত্তর না পাইয়া নিজেও পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। "নীলমণি আমার ভাইয়ের মত! তাকে আমি কত ভালবাসি" এই কথা কয়টি মাত্র বুকে লইয়া সে আজ ছয়মাস কাটাইতেছে, কিন্তু সব সময় আর তাহা মনে থাকে না; অন্যত্র জীবিকান্বেষণে যাইতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগে, কিন্তু কাজে এখনো তাহা সে করিয়া

উঠিতে পারে নাই। আবার সম্মুখে পূজা, নরেনরা বাড়ী আসিবে। স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছাটা এখন আবার তাহার মন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এবার নরেন্দ্র বাটী আসিলে সে চাকরের মতই দূরে দূরে থাকিত। এইরূপে রুদ্ধ অভিমানের বেদনা যখন দিনে দিনে পাহাড়ের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল, তখন সহসা একদিন সে শুনিল যে, নরেনের সহিত তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।

এক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা সে যাইতে পাইলে জগতের আর কিছুই বোধ হয় চাহিত না, কিন্তু আজ আর সেদিন নাই! তবু নরেন যখন তাহাকে সহাস্যমুখে বলিল, "নীলমণি, আমার সঙ্গে এবার তোমায় কলকাতা যেতে হবে ভাই, নইলে আমার ভারি অসুবিধা হচ্ছে! আমায় ত জানই, কিচ্ছু ঠিক রাখতে পারি না। পুঁটেটাকে দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেটা ভারি চোর হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু যতই হোক, তবু আমাদের সব দেখত শুনত তো! আমারই সব চেয়ে কষ্ট হচ্ছে, তোমায় যেতে হবে ভাই।" তখন একটুখানি আনন্দের আভাসও যেন মনের মধ্যে দোলা দিয়া গেল। নরেনের যে তাহাকে এটুকু দরকার বোধও হইয়াছে, এ-ও তাহার পক্ষে অনেক লাভ। আর, সব চেয়ে বড় কথা, সে তাহা হইলে নরেনের কাছে থাকিতে পাইবে! যদিও আর এখন সে নরেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবী করে না, তথাপি তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বন্ধন যে এইখানেই!

কলিকাতায় গিয়া সে সুখী বই অসুখী হইল না, যাহার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সে জমিদার বাড়ীর 'হারির পারির' ফরমাইস খাটিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারই সেবা করিতে সুখ ছাড়া অসুখ আসিতে পারে না। বন্ধুত্বের দাবীর অভিমানের শেষতম কণাটুকুও ক্রমে নীলমণির মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে-ছিল। জননীর মত ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ স্নেহে সে নরেনের সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিত। এই যত্ন করিতে পাওয়ার সুখ ক্রমে তাহার বন্ধন নিবিড়তম করিয়া দিতে লাগিল। মাঝে যে উদাস ভাব তাহার মনে কদাচিৎ উঁকি মারিত, কলিকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও মন হইতে নীরবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। একদিন সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, "নীলমণি! পড়তে ইচ্ছা কর যদি তোমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দি!" ম্লান হাসিয়া নীলমণি উত্তর দিয়াছিল, "আর না দাদাবাবু।"

সুখে থাকিতে পাইলে স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তাও মানুষকে ক্রমে আসিয়া ধরে। নীলমণির এই সুখের মধ্যেও যে দিন সুরেন্দ্র-বাবু বাসায় না থাকিতেন সেইদিন স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়া যাইত। সেইদিন নরেনের বন্ধুরাই বাসায় সমবেত হইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। তাহাদের বেসুরো বেতালা হরেক রকমের গানে ও হারমোনিয়ম বাজানার শব্দে 'হাত হইতে আম ডাগর' গোছের বকামিপূর্ণ ইয়ার্কিতে তাস, লেমনেড, বরফ ইত্যাদি অশেষবিধ ফরমাইসে নীলমণি অস্থির হইয়া পড়িত। তাহাদের 'ওরে নীলে', 'ওহে নীলুখুড়ো', 'ও সবে ধন নীল

রতনমণি' ইত্যাকার অভদ্রোচিত ভাষার জন্যও সে তাহাদের অধিকতর ঘৃণা করিত। অখিলনাথ ওরফে 'প্রিন্স রঞ্জি'ই এরূপ ভাষা ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং নরেনের সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্য বন্ধু। খেলার সুযশের জন্য সে সুরেন্দ্রনাথেরও একটু প্রিয়পাত্র। সেজন্য তাহার গতিবিধিও সকলের অপেক্ষা ঘন ঘন। নীলমণির অস্বাচ্ছন্দ্যতা ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছিল।

এই ষোড়শ বর্ষীয় 'প্রিন্স রঞ্জি'র অকালপক্কতা সম্বন্ধে শীঘ্রই সে একটা এমন প্রমাণ পাইল যে, তাহার ঘৃণা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। একদিন নরেন্দ্রের অসাক্ষাতে অখিলনাথ তাহার হাতে পয়সা দিয়া এমন একটা জিনিষ আনিতে বলিল যে, নীলমণি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়া বলিল, "খবর্দ্দার, আমায় ওসব জিনিষ আনবার ফরমাইস করবেন না। আমি আপনার চাকর নই, এটা সর্ব্বদা মনে রাখবেন।" অখিল অপ্রস্তুত হইবার ছেলে নয়, অম্লান মুখে বলিল, "ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভূত! নেশার জিনিষ হাতে করলেই জাত যাবে, সেই ভয়ে ম'লো! আচ্ছা, যদি তোর মনিবে এনে দিতে বলে?"—নীলমণি গুমরাইয়া অস্পষ্ট গর্জ্জনে বলিল, "সেদিন—দেখা যাবে।"

অখিলের এই স্বভাবের কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে কি না ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে শুনিল যে, মেসে থাকার অসুবিধা হয় বলিয়া অখিলনাথ নরেন্দ্রের সাদর আহ্বানে কিছু দিনের জন্য তাহাদেরই বাসায় আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এ সংবাদে নীলমণির অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। নরেন্দ্রের অমঙ্গল

আশঙ্কায় সে অত্যন্ত বিচলিত হইল। বন্ধুর নামে লাগাইতে আসিয়াছে বলিয়া নরেন নীলমণির প্রতি যদি অসন্তুষ্টও হয়, তথাপি তাহার এরূপ স্থলে চুপ করিয়া থাকা কোন মতেই উচিত নয়। অনধিকারের অভিমানও তাহাকে এক্ষেত্রে আর বাধা দিতে পারিল না।

বলিয়া কিন্তু কোন ফল হইল না। নরেন একটু হাসিয়া বলিল, "যারা খুব খেলোয়াড় হয়, তাদের একটু আধটু নেশা না করলে চলে না। আর, 'কোকেন' তো মদের মত অনিষ্ট করে না—শহরের ছেলেরা প্রায়ই খায়,—আমাদেরই ভাল লাগে না। যা' হোক্ আমি অখিলকে বারণ করে দেব—তোমায় আর না সে এরকম ফরমাইস করে। তুমি যেন দাদাকে একথা বলোনা কখনো।"

তাহা সে অবশ্য বলিবে না। কিন্তু নরেনের কথায় সে অবাক হইয়া গেল। কোকেন অনিষ্টকারী নয়, নেশা না করিলে খেলা হয় না! কি জানি হইবেই বা! কিন্তু এমন খেলারইবা কি দরকার, যাহাতে নেশা হয়। যাক্, সে পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত, তাহার বেশী কথায় কাজ নাই।

অখিল নরেন্দ্রের নিকট বাস করিতে লাগিল এবং নীলমণিকে আর কখনো সেরূপ ফরমাইস করিত না বটে, কিন্তু নীলমণিকৃত সেদিনের অপমানও সে ভুলিতে পারিল না। সেই দিন হইতে নীলমণির উপর তাহারও বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। যখন তখন যে কোন উপায়ে নীলমণিকে সে অপদস্থ এবং তিরস্কৃত করিবার চেষ্টায় থাকিত। নীলমণির প্রত্যেক কাজেই

খুঁত বাহির করিয়া—'নবাব খাঞ্জাখাঁ'—'কুড়ের বাদ্‌শা'—'ভিজে বেড়াল' প্রভৃতি নামকরণ করিয়া—আলো ভাঙ্গা—ঘড়ীর কল খারাপ ক'রে দেওয়া—পানে ইচ্ছে ক'রে চূণ বেশী দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি অপবাদ দিয়াও সে নীলমণির কিছু করিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথের সমক্ষে এসব বড় বেশী প্রকাশিত হইত না, যৎসামান্য যাহা কিছু হইত, অখিল অভ্যাগত বলিয়া তিনিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেন না এবং নরেনও নীলমণির অজস্র নিন্দা শুনিয়াও এক ভাবেই চুপ করিয়া থাকিত। নীলমণিও অখিলের নিষ্ফল রোষের দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে একটা আমোদ অনুভব করিতে লাগিল।

সে দিন সুরেন্দ্রনাথ বা নরেন্দ্র কেহই বাসায় ছিল না। অখিল অসময়ে কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া ডাকিল—"নীলে!" নীলমণি সযত্নে নরেনের কাপড় কোঁচাইতেছিল, বিরক্তিভরা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল "যাচ্ছি।" ক্ষণপরে উচ্চতর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "এই নীলে। নবাবের ঘুম আর ভাঙ্গে না!" অধিকতর বিরক্ত হইয়া নীলমণি উত্তর দিল, "দাদাবাবুর কাপড় কোঁচাচ্ছি।"

"কাপড় কোঁচাচ্ছ না মাথা।—প'ড়ে প'ড়ে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে! আজ কৃত্তিবাস ঠাকুরের শাস্তি হবে দেখছি কিছু আমার হাতে! শুনে যা বলছি—"

স্থির দৃঢ় কণ্ঠে নীলমণি বলিল, "কি দরকার বলুন—নইলে উঠব না, কোঁচানো নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কি! দরকার না বললে তুই উঠবি না?—ড্যাম্ ষ্টুপিড্ রাস্কেল্—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা,—বাঁদি-কি-বাচ্ছা!"

নীলমণি বস্ত্র ফেলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে গৃহ মধ্যে গিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিল "চুপ! আর জিভ নাড়বে কি তুমি গিয়েছ। নরেনের বন্ধু ব'লে ঢের সয়েছি—চুপ!" অখিল ক্ষণকাল যেন বাক্ রহিত হইয়া গেল—কিন্তু নীলমণি যখন তাহার প্রশান্ত মুখে বলিল, "বল তোমার কি চাই?"—তখন নষ্ট সাহস পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অখিল ছুটিয়া গিয়া নীলমণির ঘাড় ধরিল—"হারামজাদা!" তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল—নীলমণি এক হাতে তাহার ক্ষীণ লম্বা দেহ শূন্যে উত্তোলন করিয়া বলিল, "কেমন—এখন! দিই এক আছাড়?" তাহার পরে নিঃশব্দে অখিলকে একটা ঝাঁকুনি দিয়া নামাইয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

অখিল সামলাইয়া লইয়া মহা সোরগোলে কুলী ডাকাইয়া নিজের জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল! তখন নরেনও কলেজ হইতে আসিয়াছে। সে চমৎকৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের পর কতক তথ্য অবগত হইল। তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "ওঃ এই জন্য এত? নীলমণিকে এখনি শাসন করে দিচ্ছি—এরই জন্য তুমি এত কাণ্ড করছ!—ছিঃ!" অখিল গম্ভীর মুখে বলিল, "না না নরেন—বিষয়টা তুমি যত সামান্য মনে করছ, তত সামান্য নয়! শেষ কালে কি বন্ধুর বাড়ী থেকে বন্ধুর চাকর ঠেঙ্গানো বদনাম নেব?" অখিল তখনো নিজের গর্ব্বটুকু ছাড়ে নাই শুনিয়া অন্তরালে নীলমণি হাসি চাপিতে পারিল না।

"আর, একটা চাকরের ওপর রাগ ক'রে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, এ ব্যাপারে তুমি কি বিষয়টাকে অযথা বাড়াচ্ছো না? যাকে একটু শাসন করলেই গোল মিটে গেল, তার উপরে রাগ? ছিঃ! তুমি কি রাগের আর পাত্রও পেলে না! আঃ—মাথাটা যে বেজায় গরম করে ফেলেছ দেখছি। চল, একটু বেড়িয়ে আসি, দোকান থেকেই চা-টা খেয়ে নেব এখন আজ,—চল।"

উভয়ে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গেল। নীলমণি বারাণ্ডায় থামের পাশে এক ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল। ষ্টোভে চা-এর জল ফুটিয়া যাইতেছে—হস্তে তাহার জলখাবার সজ্জিত রেকাবী।

সে চাকর, এ কথাতো সবাই জানে, সকলেই বলে! একথা এমন নূতন কথাই বা কি? সে চাকরের মত থাকে, চাকরের কাজ করে! সে যে স্বেচ্ছায়ই একদিন নরেনের বাড়ীর সকলেরই চাকর হইয়াছিল। আজ নরেনের মুখে এ কথায় তাহার তবে কেন এত বাজিল?

হ্যাঁ—সে চাকর বটে, কিন্তু—ঐ একটা কিন্তু! ঐ 'কিন্তু' তেই সব গোল হইয়া যাইতেছে! বুকের ভিতর একটা বেদনা শেলের মত ফুটিতেছে, চক্ষের জল অসংবরণীয় হইতেছে। সে চাকর—কিন্তু "নীলমণি আমার ভাই"—এই কথাটি যে সে কখনো ভুলিতে পারে না, অহরহ অন্তরে অন্তরে সুমিষ্ট রাগিণীর মত বাজিতে থাকে এবং সে সুখের মাদকতায় সে যে জননীর মত—জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মত নরেনের সর্ব্বসেবা আদরের সহিত বুকে করিয়া লয়, তাহার আত্মীয়দিগের আদেশ মাথায় করিয়া

লয়। আজ সে শুনিল, সে এমনি চাকর—যে তাহার উপরে রাগ করাটাও অন্যের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে কলিকাতাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, সে অন্ধকার দূর করিবার জন্য গ্যাসপোষ্টগুলা যেন উজ্জ্বল মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, রাস্তার ফিরিওলা হাঁকিতেছে—'বরফ'—'অবাক জলপান'।

নীলমণি একবার আলোকিত কক্ষের পানে চাহিল। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল, তিনি যেন তাহাকে খুঁজিতেছেন—"নীলমণি!—কোথায়?" নীলমণি মস্তক নত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল, মনে পড়িল, জগতে কেবল এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভালবাসার নিকটে তাহার এরূপে আত্মসম্মান বিক্রয় পছন্দ করেন নাই। তাহার স্বতন্ত্র মূল্য, ইনি শেষ পর্য্যন্তই যেন নীলমণিকে ইহা বুঝাইতে চাহিতেন। নীলমণি তাহা বুঝিতে চাহে নাই, তাই ইঁহার নিকটে যাইতেও সঙ্কুচিত হইত। আজ যাইবার দিন—মস্তক নত করিয়া সে তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিল।

তাহার পরে একবার নরেন্দ্রের কক্ষের পানে চাহিতেই হুহু করিয়া প্লাবনের মত অশ্রুস্রোত আসিয়া তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বাহিয়া ছুটিল। ত্রস্তে নির্দ্দয় পীড়নে চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে করিতে নীলমণি নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তাহার পরে সেই গলির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের মত সে নিঃশব্দে মিশিয়া গেল।

প্রত্যাখ্যান

ত্রিতলস্থ গ্যাসালোকিত কক্ষে বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথোপকথন করিতেছিল। চারিদিকে ঔজ্জ্বল্যের অজস্র সমাবেশ! উজ্জ্বল কক্ষ, বিচিত্র উজ্জ্বল গৃহসজ্জা, দর্পণে দর্পণে আলোকের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চক্ষু ঝলসিত করিয়া ফেলে। সর্ব্বোপরি দম্পতির উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, উজ্জ্বল যৌবনে অতুলনীয় শোভা। কিন্তু তাহাদের ললাটে ঘনান্ধকার ছায়া!

সহসা স্ত্রীর ভাবান্তর হইল। সে ললাটের ছায়া যেন সজোরে অপসারিত করিয়া বিশাল নয়নে হাসির ছটা আনিয়া সাদরে স্বামীর হাত ধরিরা বলিল, "আমার দিব্য, আর অমত ক'রো না; কখনও তোমায় কোনও অনুরোধ করিনি, এই প্রথম, এই শেষ, এইটি রাখ।" স্বামী মুখ তুলিলেন। সনিশ্বাসে বলিলেন, "এই অনুরোধ কি উচিত প্রফুল্ল?" "কেন উচিত নয়? গুরুজনের মনস্তাপ, এত বড় বংশ-লোপ, এতে কি এ অনুরোধ করা যায় না? আমিই কি এত বড় যে আমার জন্য এমন কাজ হবে? বাপ মা চোখের জল ফেলছেন দেখছ, এতেও কি তুমি এ কাজ উচিত মনে কর না?"

"শুধু কি তোমারি জন্য প্রফুল্ল, আমার নিজের অশান্তি কি এতে নেই?" "হ'লই বা, এত কর্ত্তব্যের অনুরোধেও যদি তুমি

নিজে এটুকু সহ্য না কর, তো তুমি পুরুষ কিসের?” “কিন্তু আর একটা যুক্তি তো আছে, পোষ্যপুত্র নিতে আপত্তি কেন কর?” “আবার সেই কথা! আমি একটি নিজের ছেলে চাই, পরের ছেলে কি তেমন হয়?”

“তবে আর কোনও উপায় নেই প্রফুল্ল?” “উপায় কিসের? বেশ একটি ছোট বোন আসবে, আমার দোসর হবে, এতে আবার চিন্তা কি?” স্বামী তারাচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তার পরে? সতীনকে স্বামীর ভাগ দিতে পারবে তো? তাতে হিংসা হবে না?” “হিংসা হবে! আমার ধনে সে বড় মানুষ হবে আমি তার হিংসা করব, আমি কি এমন দরিদ্র?” তারাচরণ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। “ওতে আর আমি ভুলছি না; বল, বিয়ে করবে বল? কালই আমি মাকে বলব।” “আর দুদিন যাক প্রফুল্ল!” “আর একদিনও যেতে দেওয়া নয়।”

২

গৃহিণী কর্ত্তাকে সুসংবাদ দিলেন পুত্রের বিবাহে মত হইয়াছে; আরও বলিলেন, “বৌমা বললেন তাঁর বাপের বাড়ীর কাছে একটি গরীবের মেয়ে আছে, বাপ নেই, মেয়েটি নাকি বেশ সুশ্রী শান্ত শিষ্ট; সেই মেয়েটি ঠিক কর।”

প্রফুল্লমুখী হাসিতে হাসিতে স্বামীকে গিয়া সংবাদ দিল। তারাচরণ নীরবে রহিলেন। প্রফুল্ল দুই হাতে স্বামীর মুখ তুলিয়া বলিল, “অত মুখ ভারী কেন? আমাকে সুখী দেখেও

কি আনন্দ হচ্ছে না?" "এখনো বোঝ প্রফুল্ল, বড় ভুল করছ।" "কিসের ভুল, মিছে ব'কো না।"

"দেখ, যাকে বিয়ে করব তার ওপরেও তো একটা কর্ত্তব্য আছে, তার ওপরেও একটু মায়া করা উচিত, সে যে নির্দ্দোষী বালিকা!

"কেন তুমি তাকে আমারি মত ভালবাসবে।"

"তুমি পাগল! মানুষ কি কখনো দুদিক সমান রাখতে পারে?"

"না রাখতে পার তুমি সেই দিকেই ভার দিও। আমি তাতে রাগ করব না।"

বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমোদের বিবাহ নয়, ধূমধাম হইবে না। এ বিবাহে কর্ত্তা গৃহিণী হইতে মায় চাকর দাসী পাড়াপ্রতিবেশী পর্য্যন্ত দুঃখিত। ক্রমে বিবাহের দিন নিকট হইল। মাথায় টোপর দিয়া গম্ভীর মুখে ফেটিঙে চড়িয়া তারাচরণ বিবাহ করিয়া আসিল।

বর কনে ছাঁদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বরণ করিতে আসিলেন। অগ্রে অগ্রে বারাণসী-পরা আপাদমস্তকমণ্ডিতা হাস্যধরা প্রফুল্লমুখী! সমাগতা আত্মীয়াগণও দেখাদেখি চোখ মুছিতেছিল। প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া প্রথমে নব-বধূর মুখ দেখিল, তার পরে নিজ গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া সপত্নীকে সাজাইয়া দিতে লাগিল। চারিদিকে তুমুল ধ্বনি উঠিল, "ওমা একি! এ যে সত্যি কাল! মেয়ে মানুষে কি সতীনকে এমন করতে

পারে ?—” বাধা দিয়া হাস্যমুখে প্রফুল্ল বলিল, “কেন তোমরা বারে বারে সতীন সতীন বলছ, কল্যাণী আমার ছোট বোন।” গৃহিণী বলিলেন, “ও বাবা তারা, যাসনে, বরণটা করে নিই, অলক্ষণ হবে, ও বাবা।”—তারাচরণ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তার পরে বধূ দেখা হইল। সকলে নীরবে রহিল। বধূ যদিও বেশ সুশ্রী, কিন্তু প্রফুল্লের মত নয়। কেবল গৃহিণী বলিলেন, “বেশ শ্রী, চোখ দুটি বড় শান্ত। পাকা চুলে সিঁদুর পর মা। আর যার জন্য তোমায় আনা, সেই আশা আমার পূর্ণ কর মা! আর কিছু চাই না।” সকলেই গৃহিণীর কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল, “তা বইকি মা, তোমার অমন সতী লক্ষ্মী দুর্গার মত বউ থাকতে কি সাধ করে এ কাজ করলে? তা যা হবার হয়েছে এখন প্রাতঃ বাক্যে বলি, একটি খোকা হোক, তাহলেই সৃষ্টি রক্ষা পায়, নইলে বৌয়ের দরকার কি মা? ছেলের জন্যেই তো”—ইত্যাদি।

পাকস্পর্শাদি হইয়া গেল। তারাচরণ নিজ কক্ষে বসিয়া কি পড়িতেছিলেন। প্রফুল্ল গিয়া বলিল, “মুখটা একবার তোল”, তারাচরণ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া পুস্তকে দ্বিগুণ মনঃসংযোগ করিলেন। “এত ভয়? চেয়েই দেখ না, আমি তোমায় মন্দ জিনিষ দিইনি!” তারাচরণ নীরবে রহিলেন। “চাইবে না?” তারাচরণ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন, “কাজ আছে, আমি নীচে চল্লাম।”—হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে প্রফুল্ল বলিল, “আর পালিয়ে কাজ নেই, যাকে এত ভয় সেই যাচ্ছে; যাও ত কল্যাণ! অন্ন ঠাকুরঝির কাছে যাও।”

বলিতে বলিতে কল্যাণী চলিয়া গেল। "নাও এখন, ব'স, সব কাজেই কি বাড়াবাড়ি ?"

"আমার না তোমার ?"

"বটে, বিয়ে করেছ! কথা কবে না ?"

"সে তো তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তার দায়ী তুমি।" মৃদু হাসিয়া স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া প্রফুল্ল বলিল, "কেন আর কাউকে পছন্দ হয় না নাকি ?" "না"—বলিয়া তারাচরণ পত্নীর মুখ চুম্বন করিলেন।

৩

অন্ন ঠাকুরঝি একজন কুটুম্ব-কন্যা, বিধবা; চিরকাল সে সেইখানেই পালিত; নব-বধূ কল্যাণী দ্বিতলের একটি নিভৃত কক্ষে তাহার নিকট শয়ন করিত। অন্নও তাহাকে সকলের অপেক্ষা একটু বেশী মমতা করে, অন্ততঃ কল্যাণীর তাহাই বিশ্বাস।

সুখও নাই দুঃখও নাই, এমনি ভাবে কল্যাণীর দিনগুলা কাটিয়া যায়। গরীবের মেয়ে, কাজকর্ম্ম করিতে না জানে এমন নয়; প্রভাতে অন্ন ঠাকুরঝির সঙ্গে কুটনো কুটিতে গেলে প্রফুল্ল আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। "ছিঃ বোন! তুমি কেন কাজ করবে ?" কল্যাণী মৃদুস্বরে বলিল, "তবে কি করবো ?" "কি আর করবে ? তোমার ঝিকে ডেকে দিই, বসে গল্প কর, তাস-টাস খেল।"

ঝি ঘর ধুইতেছে, কল্যাণী ঝাঁটা লইতে যাওয়ায় সে হাসিয়া

গলিয়া পড়িল! গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "তোমায় ওসব করতে নেই মা, তুমি উপরে থাক গে।" কল্যাণী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রন্ধন গৃহে বামনদিদি রাঁধিতেছেন, কল্যাণী গিয়া নিকটে বসিল। বামনদিদি আস্তে আস্তে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, "সে কি ছোট বউ! ধোঁয়া লেগে অসুখ করবে যে!" অন্ন ঠাকুরঝি সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "এখানে ওসব করে না, তুমি তোমার দিদির কাছে রেশমী জরি-বোনা শেখ গে।" কল্যাণী প্রফুল্লের কাছে আবেদন করিলে সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার এসব কষ্ট করে কিছু শিখতে হবে না বোন! আমি যা জানি তাতেই তোমার হবে; তুমি এখন শুধু একটি খোকা দিতে পারলেই আমাদের সব কষ্ট দূরে যায়। তোমার আর কিছু করবার বা শিখবার দরকার নেই বোন!" কথাগুলো অবশ্য খুব ভালবাসারই, কিন্তু নির্ব্বোধ কল্যাণী হয়ত তাহা বুঝিতে পারে না, তাই নীরবে ম্লান মুখে নিজের কক্ষের কোণটিতে গিয়া বসে।

কাজও নাই, কর্ম্মও নাই; একটু ভুলিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই; তাই কেবল মায়ের সেই স্নেহভরা মুখ মনে জাগিয়া উঠে! স্নেহপ্রার্থী তৃষিত বালিকা-হৃদয় তাই কেবলই হাহাকার করিতে থাকে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে প্রফুল্ল বলিল, "মুখ অত শুকনো কেন, কল্যাণী!" কল্যাণী কি উত্তর দিবে? তাই চুপ করিয়া রহিল। তাহার যে মুখ শুকনো সে ত তা বুঝিতে পারে না। চুল বাঁধা হইলে প্রফুল্ল বলিল, "একটু ব'সতো, আমি

আসছি।” প্রফুল্লের প্রস্থানের পর দাসী জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ ছোট বউদি! দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?” কল্যাণী সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিল। “বল না, লজ্জা কি? কি কথা হয়েছে?” কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, “আমি ঠাকুরঝির কাছে থাকি।” “তা দাদাবাবু তোমায় একদিনও ডেকে কথা কন নি?” “না।” দাসী প্রীতভাবে বলিল, “আহা, তিনি কি সাধে বিয়ে করেছেন? ছেলে না হওয়াতেই তো এমনটা ঘটল; অমন স্ত্রী থাকতে কি আর কাউকে স্ত্রীর মত কেউ ভাবতে পারে, না, তাই ভদ্দরের কাজ।” তা ত সত্যই! কল্যাণী নির্ব্বোধ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সে নীরব নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

৪

রাত্রি দশটার পরে তারাচরণ শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল তখনো আসে নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল; বিরক্ত হৃদয়ে তিনি শয্যার দিকে ফিরিয়া সহসা দেখিলেন, দ্বারের নিকটে অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকা! তারাচরণের বুকের মধ্যে অনেকখানি রক্ত চট্ করিয়া যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে কি রকম শব্দ হইতে লাগিল। কি করবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কল্যাণীও রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তারাচরণ বলিলেন, “প্রফুল্ল কোথায়?” কল্যাণী উত্তর দিল না। “প্রফুল্ল কোথায়?” অস্ফুট শব্দ

হইল, "নীচে।" তারাচরণ কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তোমায় সে-ই বুঝি পাঠিয়েছে?" "হ্যাঁ"। "তুমি নীচে যাও গিয়ে তাকে ডেকে দাও গে।" কল্যাণী চলিয়া গেল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কি হইতেছিল কে জানে? তারাচরণও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে অল্প হাসিমুখে অথচ গম্ভীর ভাবে প্রফুল্ল আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "ছি ছি! একি অন্যায়; জান ও তোমার স্ত্রী! ওকে আমরা সুখ দেব বলে এনেছি, কষ্ট দিতে নয়, তোমার এমন তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। ছেলে খেলার জন্যে তো আমি এমন কাজ করি নি; তুমিও জান কি কর্ত্তব্যের জন্য তুমি বিয়ে করেছ; সেইজন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব—তোমার অংশও তাকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তুমিও সেই কর্ত্তব্য মনে করে তাকে ভালবাসবে না? আদর করবে না?" তারাচরণ নির্ব্বাক রহিলেন। তখন স্বামীর গলা ধরিয়া আদরের স্বরে প্রফুল্ল বলিল, "রাগ করেছ?"

"না প্রফুল্ল, সত্যই তুমি আজ আমায় উপদেশ দিলে, আমি তোমার আদর্শে চলব।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলিল, "আমার আদর্শ? অমন কথা বলো না। তোমায় সত্য কথা বলি, আমি যতটা দেখাই সত্যই আমি কল্যাণীকে তত ভালবাসি না। সত্যই আমি তাকে যে আমার পঞ্জরভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত ভাবি না সে শুধু কর্ত্তব্যের জন্য, আমার নিজের জন্য, তোমার জন্য। তোমার ভালবাসার অচল শিখরে দাঁড়িয়ে আছি বলে তার দিকে আমি একটু দয়া দেখাতে চাই। আমার একটু স্নেহ-

কণায় যদি একটা জীবন উঁচু হয়ে ওঠে তো সেটুকু দেওয়াতে কষ্ট কি? বরং তাতে আনন্দ, নয় কি? তুমি তাকে আর তাচ্ছিল্য করো না।"

তারাচরণ পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "যার এমন মন্ত্রী পাশে, তার বুদ্ধির ভাবনা কি? তাই হবে।"

কক্ষান্তর হইতে কল্যাণী তখনো পলাইতে পারে নাই। নীচে যাইতে লজ্জা করিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে তারাচরণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যায় কল্যাণী ঘুমাইতেছে। তারাচরণ দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সন্তর্পণে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মসৃণ ক্ষুদ্র ললাটে দিবালোকে বিষাদের কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠে, এখন তাহা নির্ম্মল সমতল। তারাচরণের মনে পড়িল সেই অতি শান্ত অব্যক্ত বিষাদমাখা বৃহৎ চক্ষু দুইটি; অস্ফুট স্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণী!" নিজের কর্ণে নিজের স্বর প্রবেশ করায় তারাচরণ লজ্জিত ক্ষুব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। "ছি ছি! প্রফুল্লের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা!" গৃহের গ্যাসালোকের চাবি টিপিয়া দিলেন, গৃহ অন্ধকার হইল। শয্যার উপরে বসিতে পালঙ নড়িয়া উঠিল, নিমেষে কল্যাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল; ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" কোন উত্তর অসিল না। "ঠাকুরঝি এসেছ! বড় অন্ধকার, আলো কি নিবে গ্যাল?" স্বর বড় করুণ, ভীতিজনক; বালিকা অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, নিকটে একজন লোক, অথচ উত্তর দেয় না। "দিদি কি?"

উত্তর নাই। সভয়ে বালিকা বলিল, "ওমা—" তারাচরণ ভীতা বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি? আমি!" কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল প্রফুল্ল তাহাকে এই ঘরে আনিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করে। কল্যাণী শয্যা হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। "অন্ধকারে পড়ে যাবে, শুয়ে থাক।" কল্যাণী দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না; নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারাচরণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "অনেক রাত্রি হয়েছে, উঠে এসে ঘুমোও।" বহুক্ষণ পরে অগত্যা কল্যাণী গিয়া শয্যাপ্রান্ত গ্রহণ করিল।

তার পরে ধীরে ধীরে বৎসর ঘুরিয়া গেল। এক রকমে সকলেরি দিন কাটিতে লাগিল। প্রফুল্লের প্ররোচনায় কল্যাণী মধ্যে মধ্যে স্বামীর শয্যাভাগিনী হইত। তারাচরণেরও তাহাকে ক্রমে সহিয়া গেল।

৮

মহা ধূমধাম। সুবৃহৎ গেটের দুই পার্শ্বে মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষ। মধুর রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছে। দলে দলে কাঙ্গালীরা নববস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া কোলাহল করিতেছে। দুর্গাচরণবাবুর অদ্য সফলজীবন, তারাচরণের পূর্ণমনস্কাম; সকলের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলিয়া অদ্য তাঁহাদের একটি বংশধর জন্মিয়াছে। কল্যাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

প্রসূতির কিন্তু বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। সন্তানপ্রসবের

পরেই দুর্ব্বলতায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের পরেও তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইল। প্রফুল্ল আঁতুড় ঘরে গিয়া নবপ্রসূত সন্তানকে কোলে লইয়া বসিল। নিভৃতে তারাচরণকে ডাকাইয়া পুত্র দেখাইয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে বলিল, "কেমন হয়েছে? তারাচরণও তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ, বড় সুন্দর মানাচ্ছে।"

"কিসে?"

"তুমি কোলে নিয়ে আছ বলে! মনে হচ্ছে যেন তোমারি হয়েছে—"

"নয়, কিসে?" ঈষৎ গম্ভীরমুখে তারাচরণ বলিলেন, "তা'হলে আর দুঃখ কিসের ছিল?" শায়িতা ক্লিষ্টা কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একবার স্বামীর পানে চাহিতে চেষ্টা করিল। প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার বড় ছোট মন!"

ধূমধামে ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। কল্যাণী অনেক যত্নে কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল বলিয়া ডাক্তারে ধাত্রী দ্বারা সন্তান পালনের ব্যবস্থা দিল। শাশুড়ী বলিলেন, "কেন আমার বড় বৌমা মানুষ করবে। সে কোল ওরই।" প্রফুল্লের ক্রোড়ে নবকুমার কমল-কলিকার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বৈকালে কল্যাণী নিজ কক্ষে শুইয়াছিল। নিকটে বসিয়া অন্ন ঠাকুরঝি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। মস্তিষ্ক তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল—দাঁড়াইতে গেলে মাথা

ঘোরে। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল সে কক্ষে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ব্যজনী হস্তে দাসী। "ছাখ্ কল্যাণী, খোকা কত হাসছে! ওমা এর মধ্যে এত হাসতেও শিখেছে, ছাখ্ ছাখ্!" কল্যাণী চাহিয়া বলিল, "হুঁ!" "আচ্ছা অন্ন ঠাকুরঝি, খোকার ঠিক ওঁর মত মুখ হয় নি?" "অনেকটা হয়েছে বটে।" "এই নিয়ে আমার সঙ্গে রোজ তর্ক হয়—খোকা ঠিক ওঁর মতই হবে।" দাসী বলিল, "হ্যাঁ তেমনি মুখ, তেমনি ভাগ্যিমানের মত মস্ত কপাল!"—প্রফুল্ল শিশুকে চুম্বন করিল। অন্ন বলিল, "হ্যাঁ তবে এখন মা-টি ভাল হ'লেই হয়,—প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাতে কি ওর কিছু কষ্ট হয়েছে ঠাকুরঝি? ওকি এখন কে মা কে নয় তা' বুঝেছে?" অন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না তাকি বলছি, ছোট বউয়ের কি তোমার মত যত্ন কত্তে সাধ্যি হ'ত, তা নয়—" বাধা দিয়া দাসী বলিল, "পেটে হ'লে কি হয়, বড় বৌদিই তো হ'ল আদত মা, ছেলের জন্যেই তো ছোট বউ দিদিকে আনা—ওতো খোলস বই নয়। ভগবান না করুন, ছোট বৌদির ভাল মন্দতে কি ওর ভাগ্যি ছোট হবে?" প্রফুল্ল ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিল, "কি বলিস্ তার ঠিক নেই, বালাই।" তার পরে কল্যাণীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, "আজ কেমন আছ কল্যাণী?" "ভাল আছি।" "ক্রমশঃই ভাল হবে। খোকাকে একটু নেবে কল্যাণী?" "না, আপনার কোলেই থাক্।"

৬

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। বারান্দাটি নির্জ্জন, বড় শান্তিপূর্ণ। রেলিং ধরিয়া কল্যাণী নীরবে কত কি ভাবিতেছিল। চারি মাস খোকা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সে একবারও স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই। এতটা যে অসুখ গিয়াছে, তিনি একদিনও দেখিতে আসেন নাই। অসুখের জন্য যদিও এমন কেহ চিন্তিত হয় নাই, তথাপি দেখিতে তো সকলে আসিত। কল্যাণীর মনে হইল, সামান্য একটা দাস দাসীরও ব্যারাম হইলে স্বামী তাহার তত্ত্বাবধান করেন। ধীরে ধীরে তাহার নাসাপথ হইতে একটা মৃদু অথচ দীর্ঘকালবাহী নিশ্বাস বহিয়া গেল। অন্য মনে কল্যাণী রেলিং ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সহসা কাহার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণী গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে চাহিয়া দেখিল, একখানা কৌচের উপর বসিয়া তারাচরণ, তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া প্রফুল্ল অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিল। তারাচরণ প্রেমভরে তাহার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে রাখিয়াছেন। দুই জনে কত কথা হইতেছিল ; তাহার ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে ভালবাসা যেন উছলিয়া উঠিতেছে। লুব্ধ তৃষিত-নয়নে কল্যাণী চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে রক্তটা তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল। নিম্নে উদ্যান হইতে বাহিত মৃদুল সুবাস তখন চারিদিকে দুরাশার স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছিল।

দাসী কক্ষমধ্যে আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। পতি পত্নীতে শিশুকে আদর করিতে ' লাগিল। প্রফুল্ল বলিল,

"কল্যাণী আজ ভাল আছে, জ্বরটা হয়নি।" তারাচরণ কিছু বলিলেন না। "আচ্ছা খোকার কি নাম হবে? ভাতের তো আর বেশী দেরি নেই!"

"তুমিই পছন্দ কর না।"

"অমূল্যকুমার বেশ নাম নয় কি! বেশ অমু অমু বলে ডাকব।"

"বেশ নাম, তাই রেখো। বড্ডতো হাসতে শিখেছে, ছ্যাখ।" উভয়ে যুগপৎ শিশুকে চুম্বন করিলেন। প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল। কল্যাণী সরিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

প্রফুল্ল বলিল, "এইবার বোধ হয় কল্যাণী সারবে। মধ্যে মধ্যে যে ভাবনাটা হ'ত।" তারাচরণ একটু থামিয়া বলিলেন, "এমন বেশী ভাবনার কথা কি? আমাদের যার প্রয়োজন ছিল তাতো পাওয়া গেছে।"

"ছি ছি, এমন কথা কি বলতে আছে?"

কল্যাণী ধীরে ধীরে রেলিং ধরিয়া ধরিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। কক্ষ মধ্যে তখন অন্ধকার। উপুড় হইয়া সে শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল; হায় মানবের অভাব! তুমি যে যথার্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রফুল্ল যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া ভাবিতেছিল, "কল্যাণী কি ভাগ্যবতী!" তখন অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপরে লুটাইয়া কল্যাণী অপরের সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল!

পরদিন প্রফুল্লকে অন্ন বলিল, "রাত্রে ছোট বৌর বড় জ্বর হয়েছিল—এখনো ওঠেনি।"

৭

উপযুক্ত সমারোহের সহিত খোকার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। নাম হইল অমূল্যকুমার।

কল্যাণী ক্রমশঃ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার দেখে, ঔষধ খায়, সুনিয়মে চিকিৎসা হয়, তথাপি অসুখ সারে না। সকলে ভাবে, "অতি সুখ বুঝি মানুষের সয় না। নইলে যারা ভাগ্যিমানি, তারাই ব্যারামে বেশী ভোগে কেন?"

অন্ন নীচে কার্য্যান্তরে নিযুক্তা। কল্যাণী নিজ কক্ষে একেলা শুইয়া ছিল। জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া বেগে পাণ্ডুর মুখের উপর ছড়ানো রুক্ষ চুলগুলা লইয়া খেলা করিতেছিল। মুদিত চক্ষে কল্যাণী শুইয়া ছিল। সহসা ললাটে কাহার শীতল হস্ত স্পৃষ্ট হইল,—চাহিয়া দেখিল স্বামী!

নিকটে বসিয়া তারাচরণ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; তার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেমন আছ, কল্যাণী?" কল্যাণীর অভ্যস্ত "ভাল আছি"—উত্তর আজ মুখে আসিল না। কল্যাণীর বোধ হইল স্বরটা বড় স্নেহসিক্ত। একবার বিস্ফারিত চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, চক্ষু নত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিত প্রশ্ন হইল, "কাঁদ কেন, কল্যাণী! ডাক্তার বলেছে শীগগিরই ভাল হবে।" নিশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "আর ভাল হয়ে কি হবে?"

"কেন কল্যাণী—ভাল হবে বই কি!"

"না না আর নয়, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে, আর বেঁচে

কি হবে ?” তারাচরণ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, “ওকি কথা কল্যাণী! ওকথা কেন বলছ?” কল্যাণী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল; চোখে বড় জল আসিয়াছিল। সাদরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তারাচরণ বলিলেন, “কল্যাণী, অমন ক'রে রয়েছ কেন? বড় কি কষ্ট হচ্ছে?” “হ্যাঁ”। “কি কষ্ট হচ্চে?” অতি কষ্টে কল্যাণী বলিল, “মাথাটা বড় কেমন কচ্ছে।” “এই গন্ধটা শোঁক দেখি, মুখ ফিরিও না, গন্ধটা নাকে যাক।” মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর মধুর সুবাসে কল্যাণী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। মৃদুস্বরে বলিল, “আর না, এখন ভাল হয়েছে।” কল্যাণী হাত দিয়া শিশিটা একটু ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তারাচরণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, “সরিয়ে দিও না! আমার এই সামান্য সেবাটুকু আজ নাও তুমি!”—কল্যাণী পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিল। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপে একি অজস্র স্নেহধারা নিষেক? মরণোন্মুখ লতায় কেন আর এ শীতল বারি বর্ষণ? কল্যাণী চোখ বুজিল। “নাও কল্যাণী, আমার এই প্রথম তোমায় একটু দিতে আসা—নেবে না?” কল্যাণী সজোরে চক্ষু মেলিল। উচ্চ কণ্ঠে বলিল, “না না—নেব না। তুমি যাও, এখন আর তুমি কেন এসেছ? আর তো আমাকে দরকার নেই।” উচ্ছ্বাসের আবেগে শীর্ণদেহা দুর্ব্বল-মস্তিষ্কা কল্যাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৮

ক্রমশঃ কল্যাণী দিনে দিনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। বেশী কথা কহিতে পারে না। সন্ধ্যার পর মৃদু আলোকে অন্ন বসিয়া কল্যাণীর জন্য গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছিল। কল্যাণী সহসা মোহের ঘোরে বলিয়া উঠিল, "আর এসো না—আমি আর চাই না।" "কি বলছ কল্যাণী?" "তিনি বুঝি চলে গেছেন ঠাকুরঝি? রাগ করে গেলেন?"

"ওকি বলছ কল্যাণী—অমন করছ কেন? ওষুধ খাও।"

"ওষুধ? আর পারি না ঠাকুরঝি।" "না খেলে কি অসুখ সারে?" "অসুখ! অসুখ আর সারান হবে না ঠাকুরঝি!—আমাকে যে আর দরকার নেই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আর বাঁচিও না।"

"বালাই, তোমার কিসের দুঃখ, তুমি রাজরাণী, রাজমাতা।" —কল্যাণী মৃদু হাসিল। দ্বিপ্রহর রাত্রে কল্যাণী বড় ছটফট করিতে লাগিল। অন্ন সভয়ে গিয়া গৃহিণী ও প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনিল। প্রফুল্ল আসিয়া কল্যাণীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। গৃহিণী বাতাস করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর চঞ্চলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কেন দিদি অমন করছ?" কল্যাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বড় কষ্ট।" কর্ত্তাকে ডাকানো হইল। ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল। বাড়ীতে একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল বলিল, "কল্যাণী, অমুকে কোলে নেবে?" "না দিদি!" গৃহিণী ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "আনুক না মা, নাও একটু।" কল্যাণী একটু জোরে

বলিল, "না দিদি, আমায় একটু শান্তিতে মরতে দাও। তার কথা একটু ভুলতে দাও দিদি। সে কেন তোমার পেটে হ'ল না?"

"কল্যাণী, থাম!"

"ছোট থেকে, যে দিন এ বাড়ীতে পা দিয়েছি, শুনে আসছি তার জন্যই তোমরা আমায় স্নেহ কর, কেন আমি কি কেউ নই দিদি? আমায় তোমরা ভালবাস না? আমায় তোমরাই তো এনেছ? আমি কিসে দোষী দিদি?" গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, "ষাট বালাই! তোমায় কে ভালবাসে না মা? তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

"না না, আমি কেউ নই, আমি কেউ নই!"—ডাক্তার আসিয়া বলিল, "পূর্ণ বিকার! প্রলাপ হইয়াছে।" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অন্ন, তারাচরণকে ডাক।" অন্ন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল; জ্ঞান তখন ভাল ছিল না।

"দাদাবাবু এলেন না, জ্যাঠাই মা! নীচে চলে গেলেন।" গৃহিণী অশ্রু মুছিলেন। দাসী আসিয়া ডাকিল, "বৌদি! খোকা বড় কাঁদছে, থামাতে পাচ্ছি না, শীগগির এসো।" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কল্যাণী প্রলাপঘোরে বলিল, "দিদি! দিদি! কই এলেন না? তিনি যে এসেছিলেন— আমি যেতে বলেছি, তাঁকে ডাকো আর যেতে বলব না।" কেহ আসিল না। অন্ন মুখের উপর পড়িয়া বলিল, "কল্যাণী, কল্যাণ—কি বল্‌ছ?" অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কল্যাণী বলিল, "এস, আর যেতে বলব না, এস।"